লক্ষ্মী ও গণেশ

লক্ষ্মী ও গণেশ

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

কলিকাতা
পুরোগামী প্রকাশনী
১৯৬৩

১৩৭০

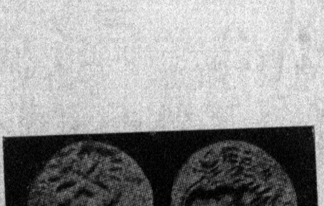
প্রকাশক
সুকুমার চৌধুরী
পুরোগামী প্রকাশনী
১০০/১ ভূপেন বোস এভিনিউ
কলিকাতা-৪

মুদ্রক
দেবী গুপ্ত
কেশব প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৫ শান্তি ঘোষ ষ্ট্রীট
কলিকাতা ৬

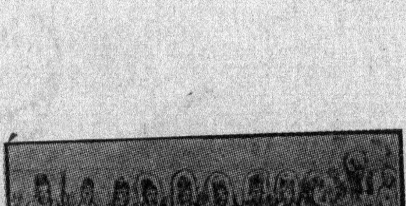
সূচীপত্র



জাভা গণেশ



লক্ষ্মীর শীল



রাবণ কা খাইয়ের দৃশ্যে লক্ষ্মী

সূচনা

অনুভূতি সকল জীবেরই আছে। জীবের জীবত্ব বা অনুভূতি নিত্যসম্পৃক্ত। জীবের স্বভাব-সুখকর অনুভূতি যাহা জীব তাহাই চায়। দুঃখকর অনুভূতি হইতে জীব সর্বদা দূরে থাকিতে চেষ্টা করে। সুখানুভূতি জীবের পক্ষে স্বাভাবিক, দুঃখানুভূতি অস্বাভাবিক,—সুখ বাধা পাইলেই দুঃখানুভূতি হয়। যখন প্রকৃতির কার্য অবাধে চলে, তখনই সুখ; প্রকৃতির কার্যে বাধা উপস্থিত হইলেই দুঃখ হয়।

সুখ ইষ্ট, দুঃখ অনিষ্ট। ইষ্টানিষ্ট হইতে ধর্মাধর্ম। যাহা স্বাভাবিক তাহাই ধর্ম, যাহা অস্বাভাবিক তাহাই অধর্ম। সুখের দিকে ধাবমান হওয়া জীবের স্বভাব; সুতরাং জীবের তাহা ধর্ম।

আহার, নিদ্রা ও মৈথুন জীবমাত্রেরই সাধারণ ধর্ম। মানুষ ও ইতর জীবে প্রভেদ এই যে, মানুষকে কতকগুলি অতিরিক্ত ধর্ম পালন করিতে হয়। জীবের ধর্ম স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে। মানুষের প্রকৃতি অনুসারে মানুষের ধর্ম। প্রকৃতিকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে না; সুতরাং মানুষ স্বপ্রকৃতি অনুসারে চলিতে বাধ্য। যখন মানুষ নিম্নস্তরে থাকে, তখন দুঃখ পরিহার করিবার চেষ্টাই তাহার ধর্ম। যাহা মানুষকে সুখ দেয়, যাহা দুঃখ দেয়, মানুষ প্রথমাবস্থায় তাহাকে শক্তিমান্ বলিয়া মনে করে। তাই মানুষ সে অবস্থায় সুখদায়কের উপাসনা করে, দুঃখদায়ককে সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করিতে চেষ্টা করে। পূজার অর্থ সন্তুষ্ট করা। দুঃখের নিগ্রহ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য তাই দুঃখের দেবতার পূজাই প্রথমে বিহিত হয়।

কারণানুসন্ধানপ্রবৃত্তি মানুষেরই আছে, ইতর প্রাণীর নাই। সুখ স্বাভাবিক; প্রকৃতির গতি বাধা না পাইলে, সুখের অভাব

হইবে না। কিন্তু দুঃখ হয় কেন? প্রকৃতির গতি বাধা পাইলে তবেই তো দুঃখ। এ বাধা কে দেয়? এমন কোন শক্তি আছে যাহা প্রকৃতির স্রোতে বাধা দেয়। সে শক্তিকে কেহ দেখিতে পায় না, তাহার কোন মূর্তি নাই। কিন্তু মানুষ যাহা আছে বলিয়া জানে, তাহার একটা মূর্তি কল্পনা করিয়া লইতে বাধ্য হয়। যাহার মনের যেরূপ গঠন, তাহার কল্পনার গঠন সেইরূপ হয়। নিম্নস্তরের মানুষের কাছে দুঃখ দেবতামূর্তি গ্রহণ করিয়া আসে। মানুষ তাহাকে তুষ্ট করিয়া বিদায় করিবার চেষ্টা করে। ধর্মের প্রথম স্তরে ভূত, প্রেত প্রভৃতির পূজা প্রচলিত হয়। সেই সময় মানুষ বৃক্ষাদিতে বা মূর্তিতে এই সকলের পূজা করিয়া থাকে।

দ্বিতীয় স্তরে মানুষ শুধু দুঃখের পরিহার করিয়া সন্তুষ্ট হয় না। সুখের উপাসনায় তাহার প্রবৃত্তি হয়। প্রকৃতির যে অবিরাম স্রোত, যাহা জীবের সুখের নিদান, তাহারও তো কর্তা আছে। এই অবস্থায় দুই শক্তির অনুভব হয়, প্রকৃতির স্বাভাবিক প্রবাহ এক শক্তির কার্য, সেই প্রবাহে বাধা প্রদান করা, আর এক শক্তির কার্য। এক শক্তি সুখদায়ক ও আর এক শক্তি সুখের প্রতিরোধ করিয়া থাকে।

মানুষের জীবন সুখদুঃখময়, কিন্তু মানুষ চায় সুখ, দুঃখ চায় না। দুঃখ হইতে অব্যাহতি পাইবার চেষ্টাই জীবন। দুঃখ হইতে অব্যাহতি পাইলেই সুখ হয়। এই সুখ ও দুঃখ সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। কেহ বলেন, সুখ বলিয়া কিছু নাই। আমরা দুঃখের দ্বারা আক্রান্ত হইলে, তাহা হইতে অব্যাহতি পাইবার চেষ্টা করি, চেষ্টার ফলে দুঃখের অবসানের অবস্থাই সুখ। কেহ বা অনুমান করেন, সুখের যেখানে বাধা সেইখানেই দুঃখ। আবার কেহ কেহ বলেন, সুখ দুঃখে কোন প্রভেদ নাই; সুখ ব্যতীত দুঃখের ও দুঃখ ব্যতীত সুখের অনুভূতি হইতে পারে না, সুতরাং সুখ দুঃখকে ছাড়িয়া থাকে না, দুঃখও সুখকে ছাড়িয়া থাকে না। উহারা উভয়েই মূলে এক জিনিষ। সুখের চেষ্টায় ঘুরিয়া আমরা সুখকে পাই না, দুঃখ সুখের চিরসঙ্গী।

প্রাচীনকালের মানুষ শক্তিমাত্রকেই দেবতা জ্ঞান করিত। তাহারা সুখের শক্তি ও দুঃখের শক্তি অনুভব করিত। সুতরাং সুখদায়ক ও দুঃখদায়ক উভয়বিধ দেবতা তাহারা কল্পনা করিত। দুঃখের অবসানে সুখ আপনিই আসিয়া পড়ে, সুতরাং দুঃখদায়ক দেবতাকেই স্বভাবতঃ তাহারা তুষ্ট করিবার বেশী চেষ্টা করিত। অনেকের মনে ধারণা, দেবতা ও ঈশ্বরের ভাব মানুষের মনে প্রথমে এইভাবে আসিয়াছিল। পশুপক্ষীও মানুষের মত সুখদুঃখময় জীবন বহন করে। তাহারাও সুখের চেষ্টায় ঘোরে, দুঃখ হইতে অব্যাহতি পাইতে চায়, কিন্তু তাহাদের বিচারশক্তি ও কল্পনাশক্তি নাই; তাই তাহারা সুখদুঃখময় সংসারের ভিতর হইতে দেবতা বা ঈশ্বরকে বাছিয়া বাহির করিতে পারে না; দুঃখ ও বিপদ্ মূর্তিমান্ হইয়া মানবের সম্মুখবর্তী হইলে, মানব ভয়ে তাহাদিগকে পূজা করিতে প্রবৃত্ত হয়। তাহাদিগের হাত এড়াইবার জন্য তাহাদিগের তুষ্টির চেষ্টাই তাহাদিগের পূজা। আমরা মানবসমাজে ইহার লক্ষণ এখনও দেখিতে পাই। মানব শনির পূজা করে, শীতলার পূজা করে, ষষ্ঠীর পূজা করে, অলক্ষ্মীর পূজা করে, আরও কত দুঃখদায়ক দেবদেবীর পূজা করে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আপাততঃ মনে হয়, মানুষ প্রথমে দেবতাদিগকে ভয়েই ভজে, ভক্তিতে নয়। কিন্তু আমরা মানবজাতির ইতিহাস আরও ভাল করিয়া দেখিলে আমাদের অন্যরূপ মনে হয়। সকল মানবজাতিই প্রাচীন কাল হইতে সর্বশক্তিমান্, পরম-মঙ্গলপ্রদ ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিয়া আসিতেছে; সকল মানবজাতিই পরকালে বিশ্বাস করিয়া আসিতেছে। অন্ততঃ ইহা অস্বীকার করা যায় না যে, পরকালের প্রতি বিশ্বাস মানব বরাবরই করিয়া আসিতেছে। পরকালের বিশ্বাসের সঙ্গে ভয়ে ভজার সঙ্গতি থাকিতে পারে না। মানুষ বিচারের আশা না করিয়া, পরকালের ধারণা করিতে পারে না। বঙ্গদেশের ইতিহাসে দেখিতে পাই, বাঙ্গালীরা এক সর্ব-শক্তিমান্ ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিত, কিন্তু তাহারা পূজা করিত

দুঃখদায়ক দেবতাগণকে। পাহাড়ের উপরে, বনে ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুর ভয়, সুতরাং তাহারা বনকে, পাহাড়কে পূজা করিতে বাধ্য হইত; নদীতে হাঙ্গর কুমীরের ভয়, ডুবিয়া মরার ভয়, সুতরাং নদীকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য তাহারা ছাগ ও মেষ নদীর জলে নিক্ষেপ করিত।

ঈশ্বরের সম্বন্ধে জ্ঞান মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। আমি আছি, এই জ্ঞান মানুষের পক্ষে যেমন স্বাভাবিক, ঈশ্বর আছেন, সেই জ্ঞানও তাহার পক্ষে সেইরূপ স্বাভাবিক। বিজ্ঞানের আবির্ভাবের সঙ্গে মানুষের এই দুই জ্ঞানের প্রথম প্রথম কিছু ব্যতিক্রম হয়। মানুষের মনে কোন্ সময় প্রথম মৃত্যুচিন্তা আসিয়া উপনীত হইল, তাহা কেহই বলিতে পারে না। কিন্তু মানুষ চিরকালই মরিতে চায় না। চৈতন্যের একেবারে বিলোপই মৃত্যু; যতক্ষণ চৈতন্য আছে, ততক্ষণ কাহাকেও মৃত বলা যায় না। এই চৈতন্যের একেবারে বিলোপ হয়, মানুষ এই ভাব কিছুতেই সহ্য করিতে পারে না। মৃত্যুচিন্তা মানুষকে বড়ই বিহ্বল করিয়া ফেলে। যদি আশা না থাকিত, মানুষের জীবন দুর্বহ হইয়া পড়িত। মানুষ আশা করে মৃত্যু প্রতীয়মান, মৃত্যু প্রকৃত নহে। বিহ্বল হইলেই আশার বাণী শুনিতে পাওয়া যায়। মানুষ বিহ্বল হয় বলিয়াই আশা করে পরকাল আছে। জগৎ বড়ই বৈচিত্র্যময়, বড়ই কৌশলে রচিত; আমরা দেখিতে পাই, যেখানে যেটুকু দরকার, জগতের সেখানে সেটুকু আছে। আশা মানুষের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে; ইতর জীব আশার বাণী শুনিতে পায় না। মানুষের জীবনের সঙ্গে আশার এইরূপ সম্বন্ধ যে, আশার সহিত এক মুহূর্তের বিচ্ছেদও মানুষ সহিতে পারে না। মানুষের যে পরকাল আছে আশাই তাহা প্রথমে মানুষের কানে কানে বলিয়া দেয়। মানুষ আপনার মনকে প্রবোধ না দিয়া থাকিতে পারে না, মানুষের স্বভাবই এই।

মানুষ যখন প্রবলের দ্বারা অন্যায়ভাবে পীড়িত হয়, তখন মানুষ আশা করে, একজন ইহার বিচার করিবে। অনন্তের পিপাসা বরাবরই মানুষের মধ্যে অনুস্যূত আছে। পরকাল ও ঈশ্বরের

ধারণা, এই পিপাসাই মানুষকে আনিয়া দিয়াছে। ঈশ্বর যে দিন মানুষকে সৃষ্টি করিলেন, সেইদিন পরকাল ও ঈশ্বরের অস্তিত্বের ধারণা মানুষের মনে গ্রথিত করিয়া দিলেন।

আধুনিক বিজ্ঞানকেই আমরা বিজ্ঞান বলিয়া মানি, কিন্তু বিজ্ঞান কত কালের তাহা কেহ হিসাব করিয়া বলিতে পারে না। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি যত কালের, বিজ্ঞানও ততকালের। মানুষ বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে যাহা পর্যবেক্ষণ করে, তাহা হইতে সে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, তাহাই তাহার বিজ্ঞান। বুদ্ধিবৃত্তি যত পরিপক্কতা লাভ করে, বিজ্ঞানও তত উন্নত হয়। এক সময় মানুষ যাহার চাঞ্চল্য দেখিত তাহারই প্রাণ আছে বলিয়া মনে করিত। তখন মানুষের কাছে বায়ুর চৈতন্য ছিল; চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ নক্ষত্রাদিরও চৈতন্য ছিল। তখন মানুষের মনের যেরূপ অবস্থা ছিল, তাহার বিজ্ঞানেরও সেইরূপ অবস্থা ছিল। এখন মানুষের মনের অবস্থার সহিত বিজ্ঞানের উন্নতি হইয়াছে মাত্র; কিন্তু তখন বিজ্ঞান ছিল না, এখন বিজ্ঞান হইয়াছে, এ কথা বলা যাইতে পারে না। যাহা হউক, বিজ্ঞানের আলোচনা করিতে গিয়া, মানুষ ঈশ্বর হইতে তফাৎ হইয়া পড়িয়াছে।

লোকে বলে আশা মায়াবিনী। আশা মানুষকে প্রবঞ্চনা করে, সত্য কথা বলে না। কিন্তু ঈশ্বর মানুষকে যাহা দিয়াছেন, তাহা তিনি মানুষকে প্রবঞ্চনা করিবার জন্য দেন নাই। ঈশ্বর মানুষকে যাহা দিয়াছেন, মানুষ তাহার অযথা ব্যবহার করে বলিয়াই, মানুষ আপনিই প্রবঞ্চিত হয়। আশা মানব-মনের এমন একটা কিছু, যাহা মানব-মন হইতে বাদ দিলে মানব মরিয়া যায়। এমন যে জিনিষ তাহা কখনই বৃথা সৃষ্ট হয় নাই। মানব-মনে আশার কার্য আছে ও কার্যের সার্থকতা আছে। পরকাল ও ঈশ্বরের ধারণার জন্যই আশা সৃষ্ট হইয়াছে। আশার আর কোন কাজ নাই।

আমরা আশাকে টানিয়া যখন অন্য দিকে লইয়া যাই, তখনই প্রবঞ্চিত হই। একের কাজ অন্যের দ্বারা হইতে পারে না। মানুষ

সকল যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারে, সকল বিপদের সম্মুখীন হইতে পারে, যদি তাহার ঈশ্বর ও পরকালে বিশ্বাস থাকে। এই জ্বালা যন্ত্রণাময় সংসারে, এই অত্যাচার ও মৃত্যুভয়-প্রপীড়িত জগতে, আশাকে বক্ষে ধারণ না করিয়া মানুষ বাঁচিতে পারে না। কে সম্পূর্ণ নৈরাশ্যে জীবন ধারণ করিয়াছে? যখন পূর্ণ নৈরাশ্যের উদয় হয়, তখন হয় মানুষ পাগল হইয়া যায়, না হয় সে ঈশ্বরের উপরে আত্মসমর্পণ করে। পূর্ণ নৈরাশ্যে ঈশ্বর-চিন্তা ব্যতীত মানুষ ঠিক থাকিতে পারে, এমন দেখা যায় না। সর্বাপেক্ষা প্রিয় কাহারও শোকে, হয় মানুষ আশায় বাঁচিয়া থাকে, না হয় পাগল হইয়া যায়, না হয় অন্য চিন্তায় শোক প্রশমিত করে।

দেখা গিয়াছে, অত্যন্ত প্রিয়তমের মুমূর্ষু অবস্থা, তথাপি লোক আশা করিতেছে, বাঁচিতে পারে; কিন্তু যেই তাহার আশার অবসান হইবার সময় হয়, সে হয় ক্ষণকালের জন্য অজ্ঞান হইয়া পড়ে, না হয়, অন্ততঃ কিছু কালের জন্য পাগল হইয়া যায়, পূর্ণ নৈরাশ্যের অবস্থায় মানুষ বাঁচিতে পারে না;—তাই প্রকৃতির কৌশলে এইরূপ হয়। যাঁহারা পরকাল বা ঈশ্বরের অস্তিত্বে দৃঢ় বিশ্বাসবান্, তাঁহাদের এইরূপ হইতে দেখা যায়।

আমরা ন্যায়-সঙ্গত আশা রাখি, পরকাল আছে ঈশ্বরের বিচার আছে, তাহা না হইলে কে এত তুচ্ছ জীবন রাখিতে পারিত? ভয় হইতে, দুঃখ হইতে, মানব-মনে ঈশ্বরের ধারণা আসিয়াছে, ইহা অত্যন্ত কাঁচা কথা। মানব-মনের অভ্যন্তরে ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিশ্বাস না থাকিলে, পৃথিবীর কোন ঘটনাই তাহা আনিতে পারে না। ঈশ্বর মানব-মনের অভ্যন্তরে লুকাইয়া আছেন, তাই মানব-মন তাঁহাকে খুঁজিয়া পায় না।

পৃথিবীর সকল জাতিই পরকাল ও ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। পরকাল ও ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করা মানবের প্রকৃতিসিদ্ধ। মানব যুক্তি অবলম্বন করিতে গিয়া সেই বিশ্বাসকে কতক পরিমাণে হারাইয়া ফেলিতে পারে।

মানুষ যখন প্রাকৃতিক শক্তিসকলের সহিত সংঘর্ষে আসিল, সীমাবদ্ধ বুদ্ধি লইয়া যখন মনে করিল, ইহারা চৈতন্যময় ঈশ্বরের স্বরূপ তখন মানুষের নিকটে খাট হইয়া পড়িল। মানুষ মনে করিল ঈশ্বর তাহারই মত প্রকৃতি-বিশিষ্ট।

আমরা যে ভাবে ইতিহাস আলোচনা করি, তাহাতে আপাততঃ মনে হয়, মানব বুঝি সর্বপ্রথমে প্রাকৃতিক শক্তিসকলকে, এক একটী ঈশ্বর বলিয়া মনে ধারণা করিত। তাহাদের মনে ঈশ্বর সম্বন্ধে অন্য কোনরূপ ধারণা ছিল না, প্রাকৃতিক যে শক্তি তাহাদিগকে নির্যাতন করিত, তাহারা তাহাকেই পূজার দ্বারা প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করিত। ঈশ্বরে ধারণা যদি মানুষের মনে এই ভাবেই আসিয়া থাকে, তাহা হইলে ঈশ্বর অলীক কল্পনা বই আর কিছুই নয়।

কিন্তু ঈশ্বর অলীক কল্পনা নহেন, তিনি জীবন্ত সত্য। আত্মার সহিত সত্যের সম্বন্ধ নিত্য ও স্বাভাবিক। মানবাত্মার সহিত ঈশ্বরে সম্বন্ধ মিথ্যার ভিতর দিয়া হয় নাই; যেমন, আত্মা স্বভাবতঃ জানে, তাহার মৃত্যু নাই। মৃত্যুর ধারণা মানুষের সংস্কার মাত্র। মানুষের আত্মার মূলে মৃত্যুর ধারণা নাই। অভিজ্ঞতার দ্বারা মৃত্যুর ধারণা মানুষ সংগ্রহ করে। যখন মানুষ অন্য শরীরকে নিষ্পন্দ হইতে দেখে, তখন সে মনে করে, কোন জীব মরিল। পুনঃ পুনঃ এইরূপ দেখিয়া তাহার ধারণা হইল জীব মাত্রেই মরে। সেও একজন জীব সুতরাং সেও মরিবে। এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার সাধ্য মানুষ ছাড়া অন্য কোন জীবের নাই।

আত্মা স্বভাবতঃ অবিনশ্বর, সুতরাং মৃত্যুর ধারণা আত্মার পক্ষে বিসদৃশ সংস্কার। মানুষ ইহা সহ্য করিতে পারে না। সর্বজ্ঞ ঈশ্বর তাই মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি সৃষ্টি করিবার সময়, মানুষের জন্য আশার সৃষ্টি করিয়াছেন। মানুষ সেই আশায় বুক বাঁধিয়া জীবন ধারণ করিতেছে।

যাহা হউক, আমরা দেখিয়াছি, দ্বিতীয় স্তরে সুখের উপাসনায় মানুষের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। এই সুখ নানাপ্রকার, দুঃখও নানা-প্রকার। সুখ দুঃখের প্রবর্তক, সুতরাং এক নহে, বহু। ইহাই তৃতীয় স্তরের সিদ্ধান্ত। বেদের সংহিতাভাগ এই স্তরের অন্তর্গত। এই স্তরে শক্তির রূপকল্পনা প্রায় দেখা যায় না; কিন্তু শক্তিসকল অনুভূত ও নানা নামে অভিহিত হয়। দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য এবং সুখ লাভ করিবার জন্য, স্তবস্তুতির আবির্ভাব হয়। সংহিতা-ভাগের মন্ত্রসকল এই স্তবস্তুতি। শক্তির অনুভূতি সহজে হয় না। বিশুদ্ধ প্রজ্ঞাযুক্ত হৃদয়েই শক্তির অনুভূতি হয়। শক্তি-অনুভূতির পূর্ণ উৎকর্ষ সাধিত হইলে, শব্দের সাহায্যে তাহার মন্ত্ররূপে স্ফুরণ হয়। হিন্দুশাস্ত্র-মতে শব্দই ব্রহ্ম। শব্দ-ব্রহ্ম হইতে মন্ত্রের উৎপত্তি। যে শক্তি অনুভূত হয়, মন্ত্রে তাহার অভিব্যক্তি হয়।

শক্তির অনুভূতি যখন অস্পষ্ট অবস্থায় ছিল, সূক্ষ্ম ও অস্পষ্টভাবে শক্তির ধারণা যখন হয় নাই, তখন এই সকল শক্তির নাম রূপ ও মূর্তি কল্পনা ও তাহাদিগের পূজা হইত। আদি ধর্মবিশ্বাস এই স্তরের।

ক্রমশঃ সূক্ষ্মদৃষ্টি ও বিচারের দ্বারা বিবিধ শক্তি যে একেরই বিকাশ, ইহা অনুভূত হয়। এক আদ্যাশক্তি আছেন, তাঁহারই অসংখ্য বিভূতি। তখন অনুভূত হয় 'একরূপ সং'—আর ইহাতে 'বিপ্রা বহুধা বদন্তি'। এইরূপে অনুলোম বিলোম বিচারে এক হইতে বহুত্বের ও বহুত্ব হইতে একত্বের অনুভূতি হয়। স্থূলাবস্থায় একেশ্বর-বাদ; সূক্ষ্মাবস্থায় ইহাই ব্রহ্মানুভূতি। স্থূল একেশ্বরবাদ পুরাণের প্রতিপাদ্য বিষয়।

বিরাট অসীমত্ব মানবের মধ্যে অনুস্যূত থাকিলেও অসীমের ধারণা সাধারণ ক্ষুদ্র মানবের পক্ষে সু-কর নহে। অসীম ও নিরাকার ব্রহ্মকে সে ধারণায় আনিতে পারে না। যাহাকে ধারণায় আনিতে পারা যায় না, তাহার স্তবস্তুতিও হইতে পারে না; সুতরাং সাধারণ মানবের জন্য মূর্তি-কল্পনার প্রয়োজন হয়। মহাপ্রাণ মহর্ষিগণ

সাধারণের উপকারের জন্ম এইরূপ মূর্তি-কল্পনা করিলেন, তাহা পূজা ও উপাসনার যোগ্য হইল।

মানুষ মরিলে সব ফুরায় না। দেহের নাশ হয়, কিন্তু আত্মা থাকে। সকল দেশের মানব-জাতির বরাবর এই বিশ্বাস। আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব, কেহই একেবারে নষ্ট হইয়া যায় না, তাঁহারা স্থূল জগৎ হইতে সূক্ষ্ম জগতে চলিয়া যান মাত্র। এখানে তাঁহারা থাকিলে, আমরা তাহাদিগকে কত যত্ন করি। কিন্তু তাঁহারা ইহলোক হইতে প্রস্থান করিলে, সম্বন্ধ একেবারে যায় না। তাঁহারা পরলোকে আমাদের সেবা ও জল-প্রার্থী। আমরা তাঁহাদের সেবার ত্রুটি করিলে, তাঁহারা অসন্তুষ্ট ও রুষ্ট হইতে পারেন, ও আমাদের অমঙ্গল-বিধান করিতে পারেন, এখানেও সুখেচ্ছা ও দুঃখ-পরিহারেচ্ছার ভাব আসিয়া প্রভাব বিস্তার করে। পরলোকগত পূর্ব পুরুষেরা রুষ্ট হইলে অমঙ্গল ও তুষ্ট হইলে মঙ্গল বিধান করিতে পারেন; সুতরাং পূজার দ্বারা তাঁহাদিগের সন্তোষ বিধানের প্রয়োজন হয়। প্রেতাত্মাকে ধ্যানে আহ্বান করিয়া পূজা করিতে হয়, স্থূল জগতের অন্তরালে এক সূক্ষ্ম জগতের অস্তিত্বের বিশ্বাস অতি আদিম অবস্থা হইতে মানবের আছে। এই বিশ্বাসই পরকালে, স্বর্গ ও নরক-বিশ্বাসের মূলীভূত কারণ।

ঈশ্বর হইতে ছোট এবং মানুষ হইতে বড় কিছুর কল্পনায় দেবতার আবির্ভাব। জগতের সকল জাতিই কোন না কোন আকারে দেবতার কল্পনা করিয়াছে। এই দেব-কল্পনার আভাস আমরা পূর্বে দিয়াছি। মানুষ অজ্ঞতাবশতঃই যে দেবতার পূজা করে একথা বলিলে চলিবে না। যখন পৃথিবীর সকল জাতিই দেবতায় বিশ্বাস করে তখন বিষয়টীকে এক কথায় উড়াইয়া দেওয়া যায় না। এ বিষয়ে আলোচনার আবশ্যকতা আছে। দেবতত্ত্বের আলোচনায় দেবতাদের কি কার্য তাহা বুঝিতে হইবে।

হিন্দুশাস্ত্রে দেবতার নাম আছে, তাহাদের শ্রেণীবিভাগ আছে, তাহাদের নির্দিষ্ট সংখ্যা আছে, তাহারা নির্দিষ্ট স্থানে বাস করে।

প্রত্যেক দেবতার বৈশিষ্ট্য শাস্ত্র লিপিবদ্ধ করিয়াছে। এই যে দেবতা ইঁহাদের কোন মূর্তি আছে কি না। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, তাঁহারা কোন প্রাকৃত দেহ ধারণ করেন না! তবে শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, দেবতা যে লোকের উপাদানের অনুরূপ, মূর্তি সেই দেবতার সেইরূপ হইয়া থাকে। বেদে এমন অনেক মন্ত্র আছে যাহাতে দেবতার মূর্তি সূচিত হইয়াছে। বেদান্তও দেবতার মূর্তির কথা বলিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, শঙ্করাচার্য বেদান্ত-সূত্র-ভাষ্যে ইন্দ্র-দেবতা-সম্পর্কে বলিয়াছেন,—'ইন্দ্রনামা কশ্চিদ্‌বিগ্রহবান্ দেবঃ' (১.২.২৯)। আবার তিনি ৩.১.২৭ সূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন, দেবতারা একই সময়ে বহু মূর্তিতে কায়ব্যূহ সৃষ্টি করিয়া প্রকটিত হইয়া থাকেন। দেবতাদের নিজেদের প্রিয় মূর্তি আছে, তবে তাঁহারা ইচ্ছা করিলে যে কোন মূর্তি ধারণ করিতে পারেন। এইজন্য আমরা দেখিতে পাই—"ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপমীয়তে"। জৈমিনি মীমাংসা-দর্শনে বলিয়াছেন, "মন্ত্রাত্মিকা দেবতা"। যে দেবতার মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আরাধনা করা যায়, দেবতা সেই মন্ত্রের অনুরূপ রূপ ধারণ করিয়া থাকেন। মূর্তির অস্তিত্ব-সম্বন্ধে এইরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়।

পাণিনি অতি প্রাচীন বৈয়াকরণ। আজকাল পণ্ডিতগণ এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পাণিনি অন্ততঃ খৃঃ পূঃ ৮ম শতকে বর্তমান ছিলেন। পাণিনি (৫.৩.৯৯) একটী সূত্র করিয়াছেন—তাহার অর্থ এই যে, অবিক্রেয় যে 'প্রতিকৃতি', যাহা কেবল জীবিকার জন্য ব্যবহৃত হয়, তাহাতে 'কন্' প্রত্যয় হয় না। প্রতিকৃতি শব্দের অর্থ—যাহা কোন মূল মূর্তির আদর্শ। ভাষ্যকারগণ ইহাকে মূর্তি বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহা হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, পাণিনির সময়ে দেবদেবীর মূর্তি ছিল। এ সমস্ত মূর্তি বাজারে বিক্রয় করা হইত না। তবে জীবিকার্থে ব্যবহৃত হইত। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, এই মূর্তিগুলির অধিকারী মূর্তিগুলি নিজের

কাছে রাখিয়া, অপরকে প্রদর্শন করিয়া, ভিক্ষাস্বরূপ যাহা পাইত, তদ্দারাই নিজের খরচ চালাইত।

পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণের পরিশিষ্ট হইতেছে ষড়্‌বিংশ ব্রাহ্মণ। ইহার ষষ্ঠ অধ্যায়ের নাম অদ্ভুত-ব্রাহ্মণ। ইহাতে হাস্যকারী, রোদনশীল, নৃত্যকারী দেবমূর্তির উল্লেখ আছে। এত প্রাচীনকালের মূর্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধে ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর মত একরূপ নয়। অধ্যাপক ম্যাক্‌স্‌মূলর লিখিয়াছেন—"The religion of the Veda knows no idols. The worship of idols in India is a secondary formation, a later degeneration of the more primitive Worship of the ideal gods." (Chips from a German workshop, Vol, 1, p. 35)। ডক্টর বোলেনসেন (Z. D. M. G., Vol. XXII, p. 587) কিন্তু বৈদিক কালে মূর্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন—"From the common appelation of the gods as দিবো নরঃ "Men of the sky," or simply নর (later) "Men," and from the epithet "নৃপেসঃ" having the form of Men, R. V., III. 4. 5., we may conclude that the Indians did not merely in imagination assign human forms to their gods, but also represented them in a sensible manner."

যাস্কের সময় মূর্তি যে খুব বেশী প্রচলিত ছিল, তাহা তাঁহার নিরুক্তপাঠে বেশ বুঝিতে পারা যায়। নিরুক্তে তিনি বলিয়াছেন,— "এখন আমাদের দেবতাদের মূর্তি বিচার করিতে হইবে। সংহিতাতে দেবগণ এক হিসাবে নরাকৃতি। বুদ্ধিমান্ বলিয়া দেবতাদের সম্বোধন ও প্রশংসা করা হয়। দেবগণ মানবের ন্যায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-বিশিষ্ট বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহার পর পতঞ্জলি মহাভাষ্যে বিশেষ প্রচলিত মূর্তি সম্বন্ধে বলিয়াছেন—শিব, স্কন্দ, বিশাখমূর্তি—শিব, স্কন্ধ বিশাখ বলিয়াই উক্ত হইবে, শিবক, স্কন্দক, বিশাখক হইবে না। রামায়ণ-যুগে যে দেবমূর্তি দক্ষিণ-ভারতে প্রচলিত ছিল, তাহার

প্রমাণ লঙ্কায় মন্দিরের উল্লেখ—৬.৩৯.২১। লঙ্কার প্রতিমা সম্বন্ধে উল্লেখ আর এক জায়গায় আছে—প্রতিমাশ্চ প্রকম্পতে স্বিদন্তি হসন্তি চ (৬.১১.২৮)।

মহাভারতে দেবমূর্তির যথেষ্ট উল্লেখ আছে। যেমন হস্তী, অশ্ব, মানব প্রভৃতির প্রস্তরমূর্তির উল্লেখ আছে, তেমনই তীর্থে দেবমূর্তিরও যথেষ্ট উল্লেখ আছে। বনপর্বে আছে, জ্যেষ্ঠীলা দেবীর সহিত বিশ্বেশ্বরকে দর্শন করিলে মিত্র ও বরুণলোক লাভ হয়। ইহাতে মূর্তি ভিন্ন আর কিছুই বুঝায় না। অন্যত্র (১৩.২১.৬১) আছে—শিব-মূর্তি দর্শনে লোকে পাপমুক্ত হয়—"নন্দীশ্বরস্য মূর্তিং তু দৃষ্ট্বা মুচ্যেত কিল্বিষৈঃ"। ধর্ম-গ্রন্থ ধর্মতীর্থে আছে—

"তত্র ধর্মো নিত্যং আস্তে"—ধর্ম সেখানে নিত্য উপবেশন করিয়া থাকেন। 'ধর্মং তত্রাভিসংস্পৃশ্য'—ধর্মকে অভিসংস্পর্শ করিয়া—সম্ভবতঃ স্নান করাইয়া। হরিবংশে ধাতু, মৃত্তিকা, দারু, নবনীত ও লবণ-নির্মিত মূর্তির উল্লেখ আছে।

যাহারা মূর্তি নির্মাণ করে এবং বহন করিয়া থাকে মহাভারত ও মনুসংহিতায় তাহাদের নাম দিয়াছেন—দেবলক। এছাড়া মন্দির, চৈত্যের ভূরি ভূরি উল্লেখ রামায়ণ, মহাভারতে আছে। কয়েকটী উদাহরণ এই—

"দেবায়তনানি"—রামায়ণ ২.২৬.৩৩

"শ্রীমত্যায়তনে বিষ্ণোঃ"—২.৬.৪

"দেবাগারাণি শূন্যানি ন চ ভান্তি যথাপুরম্—২.৭১.৩৯

"দেবায়তনস্থা দেবাঃ"—৬.১১২.১১

দক্ষিণ-ভারতে এ পর্যন্ত যতগুলি হিন্দু-স্থাপত্যের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে প্রাচীনতম নিদর্শন হইতেছে, গুডিমল্লম্ নামক স্থানের লিঙ্গমূর্তি। মূর্তিও তত্ত্ববিদ্‌গণ ইহার অলঙ্কার প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, ইহা ভারহুত স্থাপত্য-যুগের নিদর্শন। খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকে যে লিঙ্গ-পূজা হইত, ইহা তাহার

একটী প্রমাণ। কিছুকাল পূর্বে বেসনগরে গরুড়স্তম্ভের উপর একখানি শিলালেখ পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে ক্ষোদিত আছে যে, Dionএর পুত্র Heliodoros একজন ভাগবত ছিলেন। ইনি গ্রীকরাজ Antalkidasএর রাজত্বকালে তক্ষশিলা হইতে আনিয়া বাসুদেবের গরুড়স্তম্ভ নির্মাণ করান। Antalkidasএর সময় ১৭৫ হইতে ১৩৫ খৃঃ পূঃ। শিলালিপিতে বিষ্ণু এই প্রথম বাসুদেব-আখ্যায় উল্লিখিত। ইহা হইতে স্থির করিতে পারা যায় যে, বাসুদেবের পূজা খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকেও হইত।

দেবতত্ত্বের মুখবন্ধে আজ আমরা বেশী কিছু বলিব না। ইহার পর আমরা দেবতত্ত্বের এক একটী বিশেষত্ব লইয়া আলোচনা করিব। স্তর-ভেদে দেবতত্ত্বের যুগভেদ আছে। বেদে আমরা কতকগুলি দেবতা দেখিতে পাই। সাধারণতঃ লোকের ধারণা, সেই দেবতাগুলি সমস্তই ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অন্তর্ভুক্ত। বৈদিক দেবতা পুরোহিত বা ব্রাহ্মণের একচেটিয়া সম্পত্তি নহে। আর্যগণ ভারতে আগমন করিবার পূর্বে তাহারা যে সমস্ত দেবতার পূজা করিত, ভারতে আসিয়া তাহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও মর্যাদার কিছু কিছু অবস্থান্তর ঘটে। সেই সমস্ত দেবতা বৈদিক যুগের পূর্বে, বৈদিক যুগে এবং পর যুগে কিরূপ অবস্থা লাভ করে, দেবতত্ত্বের তাহারও একটী প্রধান আলোচ্য বিষয়। বৈদিক যুগের পূর্বে কয়েকটী প্রধান দেবতা ছিল? বৈদিক যুগে আসিয়া তাহাদের নামে পরিবর্তিত হইল না বটে, কিন্তু কার্যতঃ তাহাদের ঘোর পরিবর্তন ঘটে। বৈদিক যুগে যে সমস্ত দেবতা পূজিত হইতেছিল, তাহাদের মধ্যে কয়েকটী দেবতাকে লোকে পরযুগে একেবারে ভুলিয়া গেল। যাহারা রহিল তাহাদের মর্যাদার অনেক খানিকটাবই হানি হইল। হইবার কারণ—বৈদিক যুগে লোকে যাগযজ্ঞ লইয়া এত মাতিয়াছিল যে দেবতার মধ্যে অনেকের খোঁজখবর লইবার অবকাশ জুটিত না। যে সমস্ত দেবতাদের তাহারা ভুলিল না, তাহাদের মধ্যে কয়েকটীর মর্যাদা খুব বাড়িয়া উঠিল। এ ছাড়া আর একটী নূতন

ব্যাপার সংঘটিত হইল। কয়েকটী নূতন দেবতা আসিয়া ব্রাহ্মণধর্ম্মের গণ্ডীতে আশ্রয় লাভ করিল। বৈদিক দেবতাদের অধিকাংশেরই পূজা বন্ধ হইল, তাহারা শুধু নামেই বড় রহিল। এই সময়ে দেবতারা ক্রমশঃ এক একটা কর্মকাণ্ডের বিভাগ জুড়িয়া বসিতে লাগিলেন। ঋগ্বেদের সময় যে সব দেবের যে বিষয়ে সামান্য সম্বন্ধ ছিল, অথবা কিছুই সম্পর্ক ছিল না, এখন হইতে তাঁহারা নির্দিষ্ট কার্যে অধিকারী হইয়া দাঁড়াইলেন। ঋগ্বেদের সময় বরুণের জলের সঙ্গে ক্বচিৎ সম্পর্ক ছিল, কিন্তু এখন তিনি সমুদ্রের দেবতা হইলেন। বৈদিক সবিতা ঠিক সূর্য্যের দেবতা নন্। কিন্তু পরে তিনি সূর্য্যের সঙ্গে অভিন্ন হইয়া পড়িলেন। সোম আদৌ ঋগ্বেদে চন্দ্রদেব ছিলেন না, কিন্তু পরে তিনি ঐ পদের অধিকারী হন। যমও কোথা হইতে হঠাৎ মৃত্যুলোকের অধিপতি হইয়া বসিলেন।

বিষ্ণু, প্রজাপতি ও রুদ্রের সঙ্গে যে সমস্ত বৈদিক দেবতা ব্রাহ্মণ্য-যুগে অঙ্গীকৃত হইয়াছিল, তাহাদের নাম অগ্নি, সবিতা, সোম, বসু, বরুণ, যম এবং অশ্বি-দ্বয়।

বেদের পরবর্তী যুগে কুমার, গণেশ, কুবের বা বৈশ্রবণ, কাম প্রভৃতি কয়েকজন বড় বড় দেব হইয়াছিলেন। দেবীদিগের মধ্যে লক্ষ্মী, বা শ্রী, সরস্বতী ও গঙ্গার নাম উল্লেখ্য। এছাড়া সূর্য-পত্নী সংজ্ঞা, ইন্দ্র-পত্নী শচী প্রভৃতি তো আছেনই।

দেবতত্ত্বে অসুর, দৈত্য, দানব, নাগ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, যক্ষ, রাক্ষস প্রভৃতিরও আলোচনা থাকিবে। আর একশ্রেণীর দেবতা আছেন যাঁহাদের বিষয় বিশেষভাবে আলোচ্য। তাঁহারা নরত্ব হইতে দেবত্ব লাভ করিয়াছেন।

দেব শব্দের নিরুক্তি

দেবতত্ত্বের আলোচনা করিতে গেলে আমাদের সর্বপ্রথমে বুঝিতে হইবে—দেব বা দেবতা শব্দের অর্থ বা নিরুক্তি কি? আমরা দেবতার পূজা অর্চনা করিয়া থাকি, দেবতা বলিতেও একটা কিছু বুঝি, কিন্তু এখন যাহা বুঝি, বরাবর হয়তো তাহা বুঝিতাম না, আর বুঝিলেও বোঝার মধ্যে

অনেক তারতম্য রহিয়া গিয়াছে। প্রত্যেক হিন্দুর নিকট বেদ স্বতঃপ্রমাণ, আর বেদের মন্ত্র হিন্দুর সকল প্রমাণের প্রমাণ। শাস্ত্র উপদেশ করিয়াছেন, যদি বেদের মন্ত্র বুঝিতে চাও, সর্বাগ্রেই তোমাকে মন্ত্রের ঋষি, দেবতা ও ছন্দঃ বুঝিতে হইবে; তাহা না বুঝিয়া বেদ-মন্ত্র পাঠ করিলে, স্মরণ করিলে, জপ করিলে, হোম, যজ্ঞ, বা যজন করিলে তোমাকে পাপভাগী হইতে হইবে। সেই জন্যই মহর্ষি কাত্যায়ন আদেশ করিয়াছেন—

"এতান্যবিদিত্বা যোঽধীতেঽনুব্রূতে জপতি জুহোতি যজতে যাজতে তস্য ব্রহ্ম নির্বীর্যং যাতযামং ভবতি।"—শুক্লযজুঃ সর্বানুক্রম-সূত্র।

বৃহদ্দেবতাকার শৌনক ঋষিও বলিয়াছেন, মন্ত্রের দেবতাকে ভাল করিয়া জানিতে হইবে; যিনি দেবতাকে জানেন, তিনিই মন্ত্রের প্রকৃত মর্ম বুঝিয়া থাকেন। দেবতাকে ঠিক না বুঝিলে কেহ বৈদিক বা লৌকিক কর্মের ফল পায় না।

"বেদিতব্যং দৈবতং হি মন্ত্রে মন্ত্রে প্রযত্নতঃ।
দৈবতজ্ঞো হি মন্ত্রাণাং তদর্থমধিগচ্ছতি ॥২

*　　*　　*　　*

ন হি কশ্চিদবিজ্ঞায় যাথাতথ্যেন দৈবতম্।
লৌকিকানাং বৈদিকানাং কর্মণাং ফলমশ্নুতে ॥"

—বৃহদ্দেবতা, প্রথমাধ্যায়।

মহর্ষি কাত্যায়ন ঋক্-সংহিতার অনুক্রমণিকায় এই ঋষি ও দেবতা বলিলে কি বুঝায়, তাহার আভাস দিবার চেষ্টা করিয়া বলিয়াছেন,—যাঁহার বাক্য, তিনি ঋষি। তিনি যাহা বলেন, তাহা দেবতা। সেই বাক্যে যে বস্তু প্রতিপাদ্য হইয়া থাকে, তাহাও দেবতা।

"যস্য বাক্যং স ঋষিঃ যা তেনোচ্যতে সা দেবতা।
তেন বাক্যেন প্রতিপাদ্যং যদ্বস্তু সা দেবতা ॥"

এই বাক্যে দেবতা-বস্তুর ইঙ্গিত আছে বটে, কিন্তু দেবতার ভিতর-বাহিরের কোনই সন্ধান পাওয়া যায় না। বেদে দেবতার কথা আছে,

কিন্তু বৈদিক ঋষিগণের দেব সম্বন্ধে কিরূপ ধারণা ছিল, তাহা বুঝাইবার মত কোন ঋক্ বেদে নাই, তবে বৈদিক সম্প্রদায়বিদ্‌গণের জ্ঞান-পারম্পর্যের ধারা নিরুক্তকারের সময়েও একেবারে অপরিজ্ঞাত ছিল না। প্রবচন-পরম্পরায় নিরুক্তকার যাস্কের সময়েও ক্ষীণ রেখায় সেই ধারা প্রবাহিত হইতেছিল। নিরুক্তকার যাস্ক কোন্ সময়ে জীবিত ছিলেন, তাহা নিশ্চিতরূপে বলিতে পারা যায় না। তবে প্রত্নতত্ত্বের অনুগ্রহে একপ্রকার স্থির হইয়াছে যে, যাস্ক আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে বর্তমান ছিলেন, সেই সুপ্রাচীন কালে যাস্ক নিরুক্তের দৈবতকাণ্ডে [৭ম অধ্যায়, ৪র্থ পাদ, ২য় খণ্ড (১৫)] দেব-শব্দের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন ঃ—

"............দেবো দানাদ্বা দীপনাদ্বা দ্যোতনাদ্বা দ্যুস্থানো
ভবতীতি বা যো দেবঃ সা দেবতা........."

মহর্ষি পাণিনির ব্যাকরণের অনেক ভাষ্যকার আছেন। কিন্তু যাস্ক-রচিত নিরুক্তের ভাষ্যকার অতি অল্প।

উগ্র, স্কন্দস্বামী দেবরাজযজ্বা, দুর্গ প্রভৃতি কয়েকজন নিরুক্তভাষ্যকার আছেন। ইঁহাদের মধ্যে অত্রিগোত্র দেবরাজযজ্বা ও দুর্গাচার্যের ভাষ্যই বিশেষভাবে উল্লেখ্য। দেবরাজ যজ্বা যাস্ক-লিখিত নিঘণ্টুর নির্বচন-ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতে তিনি এই বচনের এইরূপ ভাষ্য করিয়াছেন—ঐশ্বর্য দান করেন বলিয়া অথবা [illegible] হেতু "দেব" এই নাম হইয়াছে। এইরূপ যে দেব দ্যু-স্থানস্থ হন, তিনি দেবতা। অন্যত্র (পঞ্চমাধ্যায় ষষ্ঠ খণ্ডে) ইনি যাস্কের দেব শব্দের এইরূপ অর্থ নির্ণয় করিয়াছেন—

'দিব্যতি দানার্থো দীপ্ত্যর্থো বা [পচাদ্যচ্ ৩. ৩. ১৩৪]' তাঁহার মতে দিব্ ধাতুর দুইটী অর্থ—একটী অর্থ দান, আর একটী দীপ্তি। দানার্থ দিব্ √ধাতুনিষ্পন্ন দেবসংজ্ঞা বুঝাইতে তিনি বলিয়াছেন যে, ভক্তগণকে যিনি তাহাদের অভিমত দান করিয়া থাকেন, তিনিই 'দেব'—

'দাতারোঽভিমতানাং ভক্তেভ্যঃ"।

অতঃপর দেব শব্দের দীপ্ত্যর্থ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"তৈজসত্বাদ্দীপ্তা বা। দ্যুতের্বাপি বাহুলকাদ্রূপসিদ্ধি।" কুল্লুকভট্টও মনুসংহিতার দ্বাদশ অধ্যায়ে ১১১ শ্লোকের টীকায় ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন,—

"দ্যোতনাদ্দেব"।

ইহা ছাড়া দেব শব্দের আরও একটী অর্থ করিয়াছেন। দ্যুঃ বা অন্তরিক্ষসম্বন্ধী যাঁহারা, তাঁহারা দেব—"দিবঃ সম্বন্ধিনো বা দেবাঃ।" ..."দ্যুস্থানা ইত্যর্থঃ"। এই দেবতার অর্থ "রশ্মি"। 'দেবা রশ্ময় উচ্যন্তে।' এই অর্থের সমর্থনসূচক ঋক্-সংহিতার বচন উদ্ধৃত হইয়াছে—

"দেবানাং ভদ্রা সুমতির্ঋজূয়তাম্"

(১.৬.১.৫.২)

পাণিনি তাঁহার ধাতুপাঠে "দিব্" ধাতুর দশটী অর্থ দিয়াছেন—সেই দশটী অর্থ এই :

১।	ক্রীড়া	৬।	মোদ—হর্ষ
২।	বিজিগীষা	৭।	মদ
৩।	ব্যবহার	৮।	স্বপ্ন—নিদ্রা
৪।	দ্যুতি	৯।	কান্তি
৫।	স্তুতি	১০।	গতি

এই দশ প্রকার অর্থযুক্ত 'দিব্' ধাতুর উত্তর 'অচ্' প্রত্যয় করিয়া 'দেব' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। দেব ও দেবতা একই। 'দেব' শব্দের উত্তর 'তল্' প্রত্যয় করিয়া 'দেবতা' শব্দ সাধিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে পাণিনির সূত্র হইতেছে—'দেবাত্তল্'—৫.৪.২৭।

আনন্দগিরি * শঙ্কর-বিরচিত ছান্দোগ্যোপনিষদ্ভাষ্যের টীকায় "দেবাসুরা হ বৈ যত্র সংযেতিরে উভয়ে প্রাজাপত্যাস্তদ্ধ দেবা উদ্গীথ-

---

*আনন্দগিরির টীকায় 'দিব্' ধাতুর দশটী অর্থের সংবাদ প্রসিদ্ধ পণ্ডিত সাধু শ্রীযুক্ত শশিভূষণ সান্যাল মহাশয়ই তাঁহার প্রণীত "মানবতত্ত্ব" গ্রন্থে (৪১০ পৃঃ) প্রথম প্রদান করেন।

মাজহ্রুরনেনৈনানভিভবিষ্যাম ইতি—(১.২.৯)" এই ছান্দোগ্য-বাক্যের 'দেব' শব্দের অর্থ বুঝাইতে পাণিনির দিব্ ধাতুর দশটী অর্থ উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন,—

"দিব্যতের্দ্যোতনার্থো দিবু ক্রীড়াবিজিগীষাব্যবহারদ্যুতিস্তুতিমোদ-মদস্বপ্নকান্তিগতিষিতি দর্শনাত্তস্য চাজন্তস্য সতি গুণে কর্তরি যথোক্তরূপসিদ্ধিরিত্যর্থঃ।"

বৈদিক ঋষিগণ কোন্ ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া 'দেব' শব্দ ঈরিত করিয়াছিলেন, তাহা বুঝিবার উপায় না থাকিলেও পাণিনির "দিব্" ধাতুর দশবিধ অর্থ সাহায্যে 'মানবতত্ত্ব-কারের' ভাষায় বলিতে পারা যায় যে, "যিনি ক্রীড়া করেন, যাঁহার লীলা-কৈবল্যই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কারণ, যিনি অসুরগণের বিজিগীষু, পাপনাশক, যিনি সর্বভূতে বিরাজমান, ব্যবহারিক জগতে যিনি স্থাবর, জঙ্গম—নানারূপে ব্যবহৃত হয়েন, যিনি দ্যোতনস্বভাব, যাঁহার প্রকাশে নিখিল বস্তু প্রকাশমান, যিনি সকলের স্তুতিভাজন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যাঁহারই গুণকীর্তন করে, যাঁহারই বিভূতি ঐশ্বর্য খ্যাপন করে, যিনি সর্বত্র গতিশীল, সর্বব্যাপক, যিনি জ্ঞানময়—চৈতন্যস্বরূপ, অখিলগতির যিনি লক্ষ্যস্থল, তিনি 'দেব'—তিনি 'দেবতা'।

যাস্ক, পাণিনি প্রভৃতির পর কত যুগ কাটিয়া গিয়াছে, কত পরিবর্তনের মধ্য দিয়া দেবব্যঞ্জক ভাবেরও পরিবর্তন হইয়াছে। কোথাও বা পরম্পরাগত প্রভাবে ভাবের প্রাচীন অর্থ গৃহীত হইয়াছে; আবার কোন কোন স্থানে কোন কোন বিশেষ অর্থই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। আট শত বৎসর পূর্বে সায়ণাচার্য ঋগ্বেদানুক্রমণীতে বলিয়াছেন, দেবনার্থ 'দিব্' ধাতু হইতে দেব শব্দ-নিষ্পন্ন হইয়াছে; এই জন্যই 'দেব' এইরূপ বলা হইয়া থাকে। দেবন (ক্রীড়া) হেতু দেব হইয়াছে; অতএব দেবগণের দেবত্ব।

'তথা দেবনার্থে দীব্যতি ধাতুনিমিত্তো দেব-শব্দ ইত্যেতদাম্নায়তে। দেবনাদ্বৈ দেবোঽভূদিতি—তদ্দেবানাং দেবত্বমিতি'।

ঋষি যাস্ক তাঁহার পূর্বাচার্যদিগের মতের অনুবর্তী হইয়া, দেবতাদের সংখ্যা একেবারে কমাইয়া তিন সংখ্যায় পরিণত করিয়াছেন। তিনি বলেন, দেবতা তিনটী, পৃথিবী-স্থান-দেবতা অগ্নি, অন্তরীক্ষ-স্থান-দেবতা বায়ু বা ইন্দ্র এবং দ্যুস্থান-দেবতা সূর্য।

দেবতার সংখ্যা

"তিস্র এব দেবতা ইতি নৈরুক্তা অগ্নিঃ পৃথিবীস্থানো বায়ুর্বেন্দ্রো-বান্তরীক্ষস্থানঃ সূর্যো দ্যুস্থানঃ"—নিরুক্ত, ৭ম অধ্যায়, ২য় পাদ, ১ম খণ্ড (৫)।

নিরুক্তকারের এই উক্তির প্রমাণ-স্বরূপ ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১৫৮ সূক্তের প্রথম ঋকের উল্লেখ করা যাইতে পারে:

'সূর্যো নো দিবস্পাতু বাতো অন্তরিক্ষাৎ।
অগ্নির্নঃ পার্থিবেভ্যঃ।'

মহাভাগ্যহেতু দেবতার একই আত্মা বহু প্রকারে স্তুত হয়। এই জন্যই ইঁহাদের বহু নাম "মহাভাগ্যাদেকৈকস্যা অপি বহূনি নামধেয়ানি ভবন্তি।"—নিরুক্ত ৭.২.১ (৫)।

এই ত্রিদেব ব্যতীত বেদে দেখিতে পাওয়া যায়, দেবতার সংখ্যা ৩৩৩৯ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

(ক) আ নাসত্যা ত্রিভিরেকাদশৈরিহ দেবেভির্যাতং মধুপেয়মশ্বিনা।

—ঋগ্বেদ ১.৩৪.১১।

(খ) শ্রুষ্টীবানো হি দাশুষে দেবা অগ্নে বিচেতসঃ।
তান্ রোহিদশ্ব গির্বণস্ত্রয়স্ত্রিংশতমা বহ।—ঋক্ ১.৪৫.২।

(গ) যে দেবাসো দিব্যেকাদশ স্থ পৃথিব্যামধ্যেকাদশ স্থ।
অপ্সুক্ষিতো মহিনৈকাদশ স্থ তে দেবাসো যজ্ঞমিমং জুষধ্বম্॥

—ঋক্ ১.১৩৯.১১।

(ঘ) যে ত্রিংশতি ত্রয়স্পরো দেবাসো বর্হিরাসদন্।
বিদন্নহ দ্বিতাসনন্।—ঋক্ ৮.২৮.১।

(ঙ) ইতি স্তুতাসো অসথা রিশাদসো যে স্থ ত্রয়শ্চ ত্রিংশচ্চ।
মনোর্দেবা যজ্ঞিয়াসঃ।—ঋক্ ৮.৩০.২।

(চ) বিশ্বৈর্দেবৈস্ত্রিভিরেকাদশৈরিহাদ্ভির্মরুদ্ভির্ভৃগুভিঃ সচাভুবা।

—ঋক্ ৮.৩৫.৩

(ছ) ত্বব ত্যে সোম পবমান নিণ্যে বিশ্বে দেবাস্ত্রয় একাদশাসঃ।—ঋক্ ৯.৯২.৪;
শতপথব্রাহ্মণ—৪.৫.৭.২ এবং মহাভারত বনপর্ব ১৭২ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

১। ঋগ্বেদে ৩৩৩৯ দেবতার উল্লেখ—

ত্রীণি শতা ত্রী সহস্রাণ্যগ্নিং ত্রিংশচ্চ দেবা নব চাসপর্যন্।—৩.৯.৯।

এ সম্বন্ধে শতপথব্রাহ্মণ—১১.৬.৩.৪ ও শাঙ্খায়ন শ্রৌতসূত্র—৮.২১.১৪ দ্রষ্টব্য।

বৃহদারণ্যক বা বাজসনেয়ি ব্রাহ্মণোপনিষদে (তৃতীয় অধ্যায় নবম ব্রাহ্মণ) দেবতার সংখ্যা লইয়া একটী আখ্যায়িকা আছে। এই আখ্যায়িকা হইতে একটী বিশেষ তত্ত্বের আভাষ পাওয়া যায়। ইহাতে দেবতার কথা যেরূপ আছে, আমরা তাহাই বলিতেছি।

বৈদগ্ধ শালক্য জিজ্ঞাসা করিলেন—দেবতার সংখ্যা কত, যাজ্ঞবল্ক্য? তিনি উত্তর করিলেন,—৩০৩ এবং ৩০০৩।

ও! তাই—ঠিক করিয়া বলুন, দেবতার সংখ্যা কত?—তিনি বলিলেন—৩৩।

যাজ্ঞবল্ক্য, দেবতার সংখ্যা কত? তিনি বলিলেন—৬।

তাই নাকি? ঠিক করিয়া বলুন, দেবতার সংখ্যা কত? তিনি বলিলেন—৩।

তাই বুঝি! ঠিক করিয়া বলুন, দেবতার সংখ্যা কত? তিনি বলিলেন—"দুই"।

সে কি? ঠিক করিয়া বলুন, দেবতার সংখ্যা কত? তিনি বলিলেন—"দেড়"।

বেশ! ঠিক করিয়া বলুন, দেবতার সংখ্যা কত? তিনি বলিলেন—"এক"।

৩০৩ এবং ৩০০৩ এই দেবতারা কাহারা? তিনি বলিলেন,—ইহারা দেবতাদিগের শক্তি। বস্তুতঃ দেবতাদের সংখ্যা ৩৩।

ইহারা কাহারা?

তিনি বলিলেন—ইহারা অষ্ট বসু, দ্বাদশ আদিত্য, একাদশ রুদ্র, ইন্দ্র ও প্রজাপতি।

---

* শতপথ-ব্রাহ্মণেও (১১.৬.৩.৫) এই একই বাক্য পুনরুক্ত হইয়াছে—"কতমে তে ত্রয়স্ত্রিংশাদিত্যাষ্টৌ বসব একাদশ রুদ্রা দ্বাদশাদিত্যাশ্চ একত্রিংশৎ ইন্দ্রশ্চৈব প্রজাপতিশ্চ ত্রয়স্ত্রিংশা ইতি।"

বসু কাহারা—অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, আদিত্য, স্বর্গ, চন্দ্র ও নক্ষত্র।

রুদ্র কাহারা?—মানুষ ও দেবতার মধ্যে যে দশটী প্রাণবায়ু, তাহাই রুদ্র।

আর আদিত্য? বৎসরের দ্বাদশ মাস।

ইন্দ্র ও প্রজাপতি কাহারা? ইন্দ্র—বজ্র, প্রজাপতি—গোগণ।

আপনি যে ছয় দেবতার কথা বলিলেন, তাঁহারা কে?—অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, অন্তরীক্ষ, আদিত্য ও দ্যৌ।

বেশ, তিন দেবতা কাহারা?—এই তিন লোক, ইহাদের মধ্যেই সমস্ত দেব রহিয়াছেন।

আচ্ছা, দুই দেব কাহারা?—অন্ন ও প্রাণ?

এইবার বলুন, দেড় দেব কে?—যিনি এখানে পবমান হইতেছেন (অর্থাৎ বায়ু)।

এক দেব কে? প্রাণ।

শতপথ-ব্রাহ্মণ উপদেশ করিয়াছেন যে, পূর্বেও দেবতার সংখ্যা যত ছিল, এখনও তাহাই আছে। সংখ্যার ইতরবিশেষ হয় নাই। ব্রাহ্মণে এক স্থানে আছে যে, তেত্রিশটী দেবতার একাদশটী স্বর্গে, একাদশটী পৃথিবীতে এবং একাদশটী জলে অবস্থিতি করেন। এই গ্রন্থের অন্যত্র দেখিতে পাওয়া যায় যে, বসুগণ, রুদ্রগণ, আদিত্যগণ-ভেদে দেবতা ত্রিবিধ। আবার শতপথের অপর এক স্থানে ইহাদিগকে সপ্তবিধ বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এ ছাড়া এই গ্রন্থোদ্ধৃত ৩৩টী দেবতার কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। গৃহ্যসূত্রে ৩৩টী দেবকে ব্রহ্মাত্মজ বলা হইয়াছে। শতপথে উক্ত হইয়াছে যে, দেবতার সংখ্যা পরিবর্তিত হয় না। ত্রিলোকই যে ত্রিদেব, তাহা শতপথ-ব্রাহ্মণ ও বৃহদারণ্যক মানিয়া লইয়াছেন।

ঐতরেয় আরণ্যক দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় কাণ্ডে দেবতাদের একটী বড় ফিরিস্তি দিয়াছেন, তাহার পরিচয় এইরূপ,—

ভূমা চিন্তা করিলেন,—"লোক-সমুদয়ে আমি লোকপাল প্রেরণ করিব।" অমনি জল হইতে পুরুষ সৃষ্টি করিলেন। ৫।

তিনি পুরুষের উদ্দেশে ধ্যানস্থ হইলেন, অমনি ডিম্বের ন্যায় একটী মুখ বাহির হইল। অতঃপর মুখ হইতে 'বাক্', বাক্ হইতে অগ্নির প্রাদুর্ভাব হইল। তারপর নাসাছিদ্র উদ্ভূত হইল, তাহা হইতে প্রাণ, প্রাণ হইতে বায়ুর আবির্ভাব হইল।

এইরূপে ক্রমশঃ—

চক্ষু	হইতে	দৃষ্টি,	তাহা	হইতে	আদিত্য
কর্ণ	"	শ্রবণ,	"	"	দিক্
ত্বক্	"	কেশ,	"	"	বৃক্ষ, লতা
হৃদ্	"	মন,	"	"	চন্দ্রমা
নাভি	"	অপান,	"	"	মৃত্যু
লিঙ্গ	"	বীর্য,	"	"	জল

উদ্ভূত হইল।

অগ্নি ও ঐ সমস্ত দেবতা সৃষ্ট হইয়া মহাসমুদ্রে পতিত হইল। তখন পরমাত্মা ইহাদিগকে ক্ষুধা তৃষ্ণায় অভিভূত করিলেন। ১।

তাঁহারা ক্ষুৎপিপাসাতুর হইয়া পরমাত্মাকে বলিলেন, আমাদের অবস্থিতি ও আহারের জন্য আমাদিগকে একটী স্থান দিন।

তিনি প্রথমে গাবী, তারপর একটী গৃহ সমানয়ন করিলেন।

তাঁহারা তাহাতে পরিতুষ্ট হইলেন না। তখন তিনি মানুষকে তাঁহাদের নিকটে দিলেন, তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—উত্তম। ২

তিনি তখন প্রত্যেককে প্রত্যেকের নির্দিষ্ট স্থানে যাইতে বলিলেন। ৩।

তখন অগ্নি	বাক্‌রূপে	তাঁহার	মুখে	প্রবেশ করিলেন।
বায়ু	প্রাণ "	"	নাসিকাগহ্বরে	"
আদিত্য	দর্শন "	"	চক্ষুতে	"
দিক্	শ্রবণ "	"	কর্ণে	"

তখন বৃক্ষলতা কেশরূপে তাঁহার ত্বকে প্রবেশ করিলেন।
চন্দ্রমা মন ,, ,, হৃদয়ে ,,
মৃত্যু অপান ,, ,, নাভিতে ,,
জল বীর্য ,, ,, লিঙ্গে ,,

তখন ক্ষুৎ-পিপাসা তাঁহার নিকট থাকিবার স্থান প্রার্থনা করিলে তিনি বলিলেন "ঐ সমস্ত দেবতাই তোমার স্থান, তাহাদের সহিত তোমরা সমস্ত ভোগ কর। ৫।

তারপর তিনি স্ত্রীগণকে নির্দিষ্টস্থানে যাইতে বলিলেন। ৬অ—১ কাণ্ড—১।

তারপর দেবতারা জিজ্ঞাসা করিলেন—যাহাকে আমরা আত্মা বলিয়া ধ্যান করি, তিনি কে? ।২।

যাহা দ্বারা আমরা দেখি, শুনি, গন্ধ গ্রহণ করি, কথা কহি, মিষ্ট অমিষ্টের পার্থক্য করি, মন ও হৃদয় হইতে যাহা বাহির হয়, তাহা কি?

তিনি বলিলেন, এগুলি জ্ঞান বা আত্মার বিভিন্ন নাম মাত্র। ৪।

আর জ্ঞান-সম্বলিত সেই আত্মা—ব্রহ্ম। তাহাই ইন্দ্র, তাহাই প্রজাপতি। ৫।

এই সমস্ত দেবতা জ্ঞান বা আত্মা হইতে সম্ভূত।

আমরা ত্রিদেবের কথা পূর্বে বলিয়াছি। দেবতা তিনটী। অগ্নি পৃথিবীস্থান, বায়ু বা ইন্দ্র অন্তরিক্ষস্থান এবং সূর্য দ্যুস্থান দেবতা। ইহার দ্বারা ত্রিদেবের লোক-বিভাগ নির্ণীত হইল। এইরূপ ইঁহাদের সবন, ঋতু, ছন্দঃ, স্তোম, সাম, কর্ম, স্ত্রী ও দেবগণের বিভাগ আছে। এই বিভাগের শাস্ত্রীয় নাম "ভক্তি"। ইঁহাদের প্রত্যেকের আবার 'সংস্তবিক দেব'ও আছেন। ত্রিদেবের বিভাগাদি কিরূপ, তাহা বলা যাইতেছে :—

অগ্নির লোক—পৃথিবী

"ত্রীণি জ্যোতিংষ্যজায়ন্তাগ্নিরেব পৃথিব্যাঃ"—ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (৫.৫.৭)

সবন—প্রাতঃকাল

'অগ্নয়ে বসুভ্যঃ প্রাতঃ সবনে"—ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (৩.২.২)

ঋতু—শরৎ ও বসন্ত

ছন্দঃ—গায়ত্রী, অনুষ্টুপ

স্তোম—ত্রিবৃৎ, একবিংশ

সাম—রথন্তর, বৈরাজ

কর্ম—হবির্বহন

দেবাবাহন

দার্ষ্টি বিষয়ক

সংস্তবিক দেব—রুদ্র, সোম, বরুণ, পর্জন্য, ঋতুগণ

ইন্দ্রের লোক—অন্তরিক্ষ

সবন—মধ্যন্দিন

ঋতু—গ্রীষ্ম, হেমন্ত

ছন্দঃ—ত্রিষ্টুপ, পঙক্তি

স্তোম—পঞ্চদশ, ত্রিণব

সাম—বৃহৎ. শাক্কর

কর্ম—রসানুপ্রদান

বৃত্রবধ

বলকৃতি

সংস্তবিক দেব—অগ্নি, সোম, বরুণ

পূষা, বৃহস্পতি, ব্রহ্মণস্পতি, পর্বত,

কুৎস, বিষ্ণু, বায়ু, বরুণসহ মিত্র,

পূষাসহ সোম, রুদ্রসহ সোম,

অগ্নিসহ পূষা ও বাতযুক্ত পর্জন্য

সূর্যের লোক—দ্যৌ

সবন—তৃতীয় কাল

ঋতু—বর্ষা, শিশির

ছন্দঃ—জগতী, অতিছন্দাঃ

স্তোম—সপ্তদশ, ত্রয়স্ত্রিংশ

সাম—বৈরূপ, বৈরত

সূর্যের কর্ম—রসাদান

রসধারণ

প্রবহ্লিত

সংস্তবিক দেব—চন্দ্রমা, বায়ু, সংবৎসর

অগ্নির সহচর দেবগণ অথবা পৃথিবীস্থান-দেবতা বলিলে ৫২টী দেবতা বুঝাইত। যাস্ক তাঁহার নিরুক্তে ইহাদের নাম এইরূপ দিয়াছেন,—

অগ্নিঃ, জাতবেদাঃ, বৈশ্বানরঃ

দ্রবিণোদাঃ, ইধ্মঃ, তনূনপাৎ, নরাশংসঃ, ইলঃ, বর্হিঃ দ্বারঃ, উষাসনেক্তা, দেব্যাহোতারাঃ, ত্রিস্রদেবীঃ, ত্বষ্টা, বনস্পতিঃ, স্বাহাকৃতয়ঃ।

অশ্বঃ, শকুনিঃ, মণ্ডুকাঃ, অক্ষাঃ, গ্রাবাণং, সারাশংসঃ, রথঃ, দুন্দুভিঃ, ইষুধিঃ, হস্তঘ্ন্যঃ, আভীষবঃ, ধনুঃ, জ্যা, ইষু, অশ্বাজনী, উলুখলম্, বৃষভঃ, দ্রুঘণঃ, পিতুঃ, নদ্যঃ, আপঃ, ওষধয়ঃ, রাত্রিঃ, অরণ্যানী, শ্রদ্ধা, পৃথিবী, অপ্‌বা, অগ্নায়ী, উলুখলমূষলে, হবির্ধানে, দ্যাবাপৃথিবী, বিপাট্‌ছুতুদ্রী, আর্ত্নী, শুনাসীরৌ, দেবীজেষ্ট্রী, দেবীউর্জাহুতি।

অতঃপর অন্তরীক্ষস্থান-দেবতাগণের নাম নিরুক্তকার এইরূপ দিয়াছেন ঃ—

বায়ুঃ, বরুণঃ, রুদ্রঃ, ইন্দ্রঃ, পর্জন্যঃ, বৃহস্পতিঃ, ব্রাহ্মণস্পতিঃ, ক্ষেত্রস্যপতিঃ, বাস্তোস্পতিঃ, অপান্নপাৎ, যমঃ, মিত্রঃ, কন্, সরস্বার্ক্ষ, বিশ্বকর্মা, তার্ক্ষ্য, মন্যুঃ দধিক্রা, সবিতা, ত্বষ্টা, বাতঃ, অগ্নিঃ, বেনঃ, অসুনীতিঃ, ঋতঃ, ইন্দুঃ, প্রজাপতিঃ, অহিঃ, অহির্বুধ্ন্যঃ, সুপর্ণঃ, পুরূরবা ॥ ৩২ ॥

অশ্বিনৌ, উষাঃ, সূর্যা, বৃষাকপায়ী, সরণ্যুঃ, ত্বষ্টা, সবিতা, ভগঃ।

দ্যুস্থান-দেবতাগণ বলিলে নিম্নলিখিত দেবতাকে বুঝায়—সূর্যঃ, পূষা, বিষ্ণুঃ, বিশ্বানরঃ, বরুণঃ, কেশী, কেশিনঃ, বৃষাকপিঃ, যমঃ, অজ একপাৎ, পৃথিবী, সমুদ্রঃ, দধ্যঙ্ অথর্বা, মনুঃ, আদিত্যাঃ, সপ্তঋষয়ঃ, দেবাঃ, বিশ্বদেবাঃ, সাধ্যাঃ, বসবঃ, বাজিনঃ, দেবপত্ন্যো, দেবপত্ন্য।

নিঘণ্টুতে প্রথমতঃ অগ্নি হইতে আরম্ভ করিয়া দেবপত্ন্য পর্যন্ত দেবলোকের একটী ক্রমিক তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে। তারপর নিঘণ্টুর শেষে নিম্নলিখিত শ্লোকদ্বারা দেবতাদিগের গণ নিরূপিত হইয়াছে। তদনুসারে আমরা উপরে গণ-বিভাগ করিয়া দিয়াছি। নিঘণ্টুর শ্লোক এই—

আগ্ন্যাদির্দেবী উর্জাহুত্যন্তঃ ক্ষিতিগতো গণঃ।
বায়্যাদয়ো ভর্গান্তাঃ স্যুরন্তরিক্ষস্থদেবতাঃ॥
সূর্যাদিদেবপত্ন্যন্তা দ্যুস্থান-দেবতা ইতি।

সূচনায় দিগ্দর্শন হিসাবে দেবতত্ত্বের কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলাম মাত্র। দেবতত্ত্বের আনুপূর্বিক আলোচনা বিরাট্ ব্যাপার। পৃথক গ্রন্থে তাহা আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। এখানে পৃথিবী-স্থান দেব অগ্নি সম্বন্ধে দু' একটী কথা বলিব। বৈদিক সাহিত্য আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, অগ্নিদেব যজ্ঞাগ্নির অধিষ্ঠাতৃদেব। যজ্ঞক্রিয়া ব্রাহ্মণযুগে, খুবই বাড়িয়া উঠিয়াছিল এবং ইহার সার্থকতাও সে সময়ে বিশেষভাবে অনুভূত হইয়াছিল। সেই সময়ে সকল কাজেই যজ্ঞের ধূম দেখা যাইত। এই যজ্ঞ সম্বন্ধে শাস্ত্রে নানা কথা আছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ উপদেশ করিয়াছিলেন,—প্রজাপতি কামনা করিলেন, তিনি বহু হইবেন। তিনি তাই তপশ্চরণ করিলেন। তপ করিয়া তিনি আপনার অঙ্গের যজ্ঞসূত্ররূপ এই দ্বাদশাহ দেখিতে পাইলেন এবং নিজ অঙ্গ হইতেই তিনি তাহা দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত করিলেন। তিনি তাহা আহরণ করিয়া তাহাতেই যজন করিলেন।

প্রজাপতিরকাময়ত প্রজায়েয় ভূয়াংস্যামিতি স তপোঽতপ্যত স তপস্তপ্‌ত্বা দ্বাদশাহমপশ্যদাত্মন এবাঙ্গেষু চ প্রাণেষু চ তমাত্মন এবাঙ্গেভ্যশ্চ দ্বাদশধা নিরমিমীত তমাহরত্তোমযজত।

তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণে আছে,—প্রজাপতি ইচ্ছা করিলেন—তিনি বহু হইবেন। তিনি অমনই অগ্নিষ্টোম দর্শন করিলেন। তাহা আহরণ করিয়া, তৎসাহায্যে এই সমগ্র প্রজা সৃষ্টি করিলেন।

প্রজাপতিরকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি সত্ত এতমগ্নিষ্টোমমপশ্যত্ত মাহরত্তেনেমাঃ প্রজা অসৃজত।

প্রজাপতির যজ্ঞ সৃষ্টি করার কথা বহুস্থানেই আছে। তৈত্তিরীয়-সংহিতার 'প্রজাপতিঃ যজ্ঞং অসৃজত' প্রভৃতি বচন দৃষ্টান্তস্বরূপ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

হিন্দুদিগের অনুষ্ঠান নিত্য ও নৈমিত্তিক প্রধানতঃ এই দুই ভাগে বিভক্ত। নিত্যক্রিয়া মানুষের অবশ্য করণীয়, নৈমিত্তিক ক্রিয়ায় অনুষ্ঠাতার প্রয়োজন ও ইহা ইচ্ছাসাপেক্ষ। এই অনুষ্ঠান নানা ভাবে সম্পাদিত হইয়া থাকে।

যজ্ঞ সকল আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণীর যজ্ঞকে নিত্যকর্ম, আর এক শ্রেণীর যজ্ঞকে নৈমিত্তিক কর্ম বলা হয়। এতদ্‌-ব্যতীত প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠানও আছে। এই প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান প্রায়ই যজ্ঞকার্যে ভ্রমপ্রমাদ ঘটিলে অনুষ্ঠিত হয়। প্রায়শ্চিত্তকে যজ্ঞের অঙ্গ বলা যাইতে পারে না। ইহা একটী অতিরিক্ত অনুষ্ঠান। শাস্ত্রে ইহার বিস্তৃত আলোচনা আছে। দেবতাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপক অনুষ্ঠানের কথা শুনা যায় না, এবং যাচ্‌ঞাসূচক বা প্রার্থনাসূচক অনুষ্ঠান খুব কমই অনুষ্ঠিত হয়। দেবগণ স্ব স্ব যজ্ঞভাগ লইবার জন্য আহূত হন। তাঁহাদিগের প্রতি কৃতজ্ঞতা বা তাঁহাদিগের নিকট কোনরূপ প্রার্থনা জানান হয় না। যজ্ঞে দেবতাদিগকে মন্ত্রবলে সাহায্য করিতে বাধ্য করা হয়। জাতি-তত্ত্বজ্ঞেরা বলেন যে, মানব-জাতির আদিম উপাসনা নৈতিক ভাব-বর্জিত; কারণ, আদিম মানবেরা আত্মরক্ষা ও স্বার্থসাধন উদ্দেশ্যের

বশবর্তী হইয়া উপাসনা করিত। হিন্দুর যাগযজ্ঞাদির মূলেও অনেক ইয়ুরোপীয় পণ্ডিত নৈতিক ভাবের অভাব দেখিয়া থাকেন। কিন্তু হিন্দুর পুরুষমেধ ও সর্বমেধ সম্পূর্ণ স্বার্থত্যাগসূচক যজ্ঞ। এই দুই যজ্ঞের অনুষ্ঠাতৃগণ সর্বস্ব ও সংসার-ত্যাগী হন

এই সমস্ত যাগযজ্ঞ ও ক্রিয়া-কলাপের উদ্দেশ্য দেবগণ ও পিতৃগণকে সন্তুষ্ট করা। ঋষিদিগের বিশ্বাস যে তাঁহাদের নিজেদের যেমন দেব ও পিতৃগণের সাহায্যের প্রয়োজন, দেবগণ ও পিতৃগণেরও সেইরূপ তাঁহাদের সাহয্যের প্রয়োজন। দেবগণ স্বর্গে ও পিতৃগণ অন্তরীক্ষে অবস্থান করিয়া পৃথিবীর মানবের শুভ সম্পাদন করেন, সেই জন্য মানবগণ তাঁহাদের নিকট ঋণী। মানবগণের দেবঋণ ও পিতৃঋণ পরিশোধ করা করা কর্তব্য। শুনা যায়, প্রাচীনকালে মানবগণ পূর্বপুরুষদের পূজা করিত। তাহাদের বিশ্বাস ছিল, পূর্ব পুরুষগণ পরলোকে থাকিয়া অসন্তুষ্ট হইলে ইহলোকবাসী মানবগণের অমঙ্গল, ও সন্তুষ্ট হইলে মঙ্গল বিধান করেন। কেহ কেহ অনুমান করেন, হিন্দুদিগের পিতৃকার্যের প্রবৃত্তির ইহাই কারণ। কিন্তু পিতৃপুরুষগণের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতাই যে পৈত্র্যকার্যে প্রবৃত্তির মুখ্য উদ্দেশ্য ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

আমরা হিন্দু। আমরা পিতৃঋণ পরিশোধার্থ পিতৃকার্য করিয়া থাকি। আমাদিগের পিতৃকার্য কর্তব্য বলিয়া পরিগণিত। আমাদের ধর্মভাবের সহিত অন্যজাতির ধর্মভাব মিশ্রিত আছে, একটু অনুসন্ধান করিলে তাহা বুঝিতে পারা যায়। তবে খাঁটি হিন্দু-ভাবকে বাছিয়া বাহির করাও যায়। খাঁটি হিন্দু-ভাব বলিলে কি বুঝায়? ঋষিদিগের বিশ্বাস, দেহ বিনষ্ট হইলে, মানুষ মরে না, মানুষ দেহ নহে, মানুষ আত্মা। মানুষ ভৌতিক দেহ অবলম্বন করিয়া ভৌতিক জগতে শক্তি সঞ্চয় করে, এবং সেই শক্তি বলে তাহার স্বর্গভোগ হয়। যে শক্তিতে মানব স্বর্গভোগ করে, তাহাকে পুণ্য বলে। পুণ্যক্ষীণ হইলে পুনরায় তাহাকে মর্তলোকে আসিতে হয়। পিতার উদ্দেশ্যে

পুত্র এমন কতকগুলি পুণ্যকার্য করিতে পারে যাহাতে পিতার উর্ধ্ব-গতি হয়। হিন্দু সেই জন্য সৎপুত্র কামনা করে। ইহলোকে যেমন শরীর পোষণের জন্য খাদ্য প্রয়োজন, পরলোকেও পিতৃগণের, তাঁহাদের সূক্ষ্মশরীর পোষণের নিমিত্ত খাদ্যের প্রয়োজন। হিন্দুর সকল শাস্ত্র বেদমূলক। বেদ আর্যদিগের শাস্ত্র। আর্যগণ অনার্য-দিগের সংস্পর্শে আসিয়া নূতন জিনিষ শিক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাদের ধর্ম অনার্য-ভাবাপন্ন হয় নাই। অনার্যদিগের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার তাঁহাদের ধর্মকে সম্প্রসারিত করিয়াছে। সকল মানবজাতির মধ্যে সাধারণ কিছু আছে। দেশ, কাল, পাত্রভেদে সেই সাধারণ কিছু মানবজাতিতে বিভক্ত হইয়া আছে। জাতিসকলের মধ্যে যেমন সাধারণ কিছু আছে, তেমনি অসাধারণ কিছুও বিশেষ বিশেষ জাতিতে বিশেষ বিশেষ আছে। সেই অসাধারণ কিছু জাতির বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে। আর্যধর্ম যদি অনার্য-ধর্ম হইতে সাধারণ সম্পত্তি গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহা হইলে আর্যজাতি অনার্যজাতির ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে, এ কথা বলা যাইতে পারে না। হিন্দুধর্ম সম্প্রসারিত আর্যধর্ম। ইহা অনার্য-মিশ্রিত আর্যধর্ম নহে।

এই সুখ-দুঃখময় জীবনের সঙ্গে যদি আমার পারমার্থিক ভাবে সম্বন্ধ থাকে, এবং আমার সুখ-দুঃখের কারণ আমার অতিরিক্ত অপর কিছুতে যদি নিহিত থাকে, তাহা হইলে আমাকে নির্ভরশীল হইতে হয়। কিন্তু আমার সুখ-দুঃখময় জীবনের কারণ-রূপে জ্ঞানময়, চৈতন্যময় যদি কেহ না থাকে, যদি অন্ধ জড়শক্তির প্রভাবেই আমার সুখ-দুঃখময় জীবন সম্ভূত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমার তাহার উপর একান্ত নির্ভরশীল হওয়া বৃথা প্রয়াস। ঘটনাচক্রে যাহা হইবার তাহাই হইবে। সে অবস্থায় বুদ্ধিপূর্বক ঘটনাস্রোতকে আমার অনুকূলে ফিরাইতে হয়। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে আমার বুদ্ধি আমার আয়ত্তের মধ্যে নাই; এই বুদ্ধি ঘটনাচক্রে

আমার সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। ঘটনাচক্রে যে বুদ্ধি আমার সহিত সংযুক্ত হইয়াছে, ঘটনাচক্রে তাহা আবার আমা হইতে বিমুক্ত হইতে পারে। ঘটনাচক্রে আমি উপস্থিত যে বুদ্ধি পাইয়াছি তাহার স্থিতিকাল পর্যন্ত সেই বুদ্ধির যতটুকু আমার অনুকূলে ফিরাইতে পারা যায়, আমি কেবল ততটুকুই ফিরাইতে পারি। যদি বুঝা যায় যে, আমার জন্মের পূর্ব হইতে এই বুদ্ধির সূত্রপাত হইয়াছে, এবং আমার মৃত্যুর পরেও এই বুদ্ধি অতি সূক্ষ্মাকারে আমার সহিত সংযুক্ত থাকে, তাহা হইলেও এই বুদ্ধি আমার আয়ত্তে নাই, ইহা ঘটনাস্রোতেরই আয়ত্ত। আমাকে সে অবস্থায় ঘটনা-স্রোতের উপর নির্ভর করিতে হয়। সে অবস্থায় আমার উপাসনা বা আরাধনা-প্রবৃত্তি নিরর্থক। অন্ধ প্রকৃতির ঘটনাস্রোতে ভাসিয়া আমার গতি যাহা হইবার তাহাই হইবে। হিন্দু এ অবস্থায়ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয় না। হিন্দু-দর্শনের মূলমন্ত্র এই যে, প্রকৃতি প্রকৃতির কার্য করুক তাহাতে বিমূঢ় বা অবশ হইবার প্রয়োজন নাই। আত্মার প্রকৃতিজ সুখ-দুঃখের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই, ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া আত্মার বিমুক্তি সাধন করাই কর্তব্য। অথবা প্রকৃতিকে আত্মারই শক্তিরূপে দর্শন করিয়া সেই প্রকৃতির উপর আত্মার আধিপত্য বিস্তার করিয়া প্রকৃতির বশীকরণ কর্তব্য। কিন্তু ইহা হৃদয়ঙ্গম করাও বুদ্ধি বা জ্ঞানের কার্য। এই বুদ্ধি বা জ্ঞান যদি আমার আয়ত্তে না থাকে, তাহা হইলে এই বুদ্ধি বিলুপ্ত হইলে, আমি আবার প্রকৃতির বশবর্তী হইয়া মোহ প্রাপ্ত হইব। কিন্তু হিন্দু দার্শনিক প্রকৃতির সহিত নির্লিপ্ত ভাবকেই মুক্তির সাধক বলিয়া মনে করেন। এইরূপ মনে করিবার মূলে একটা কিছু আছে। তাহা এই যে, হিন্দুর বিশ্বাস, প্রকৃতি একদিকে যেমন আত্মার বন্ধনের কারণ, তেমনই আবার অপরদিকে মুক্তির সহায়তা করিয়া থাকে। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হয়, যে, আত্মার সহিত প্রকৃতির সম্বন্ধ নিত্য ও চিরস্থায়ী। প্রকৃতি আত্মার বন্ধন ও মুক্তির

কারণ একথা বলিলে বুঝিতে হয় যে, প্রকৃতি প্রথমে আত্মাকে বন্ধন করে, এবং তাহার পর আত্মার মুক্তির পথ হয়। বন্ধনের পূর্বে আত্মার সহিত সম্বন্ধ না থাকিলে, প্রকৃতি আত্মাকে বন্ধন করিতে পারে না, প্রকৃতিজ তত্ত্বজ্ঞানের অভাব হইলেও আত্মার মুক্তির সার্থকতা থাকে না; সুতরাং বুঝিতে হইবে প্রকৃতির সহিত আত্মার নিত্য সম্বন্ধ। কিন্তু আত্মা চেতন, প্রকৃতি জড়। চেতন জড়ের আয়ত্তে আছে এরূপ মনে করা যাইতে পারে না। সুতরাং সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, প্রকৃতি আত্মার কার্যের সুবিধার জন্য যন্ত্রস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। অর্থাৎ প্রকৃতি আত্মার মায়াশক্তি. কিন্তু দেখা যায় যে, জীব প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ বশে আনিতে অক্ষম। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, জীব আত্মার সম্পূর্ণ অভিব্যক্তি নহে। আত্মার আর একটা দিক আছে, যাহা প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ আয়ত্তে রাখিয়াছে। হিন্দু দার্শনিকের মতে তাহাই ঈশ্বর। জীবভূত আত্মা ঈশ্বরের প্রতি নির্ভরশীল হইতে পারে।

উপাসনা হিন্দুধর্মের অন্তরনুষ্ঠানের দিক্। ইহাতে আচার ও বাহ্য অনুষ্ঠানও অবলম্বিত হয়।

ধর্ম মানব-জীবনে অবশ্য-পালনীয় এবং ধর্মভাব মানবের স্বাভাবিক ভাব। কিন্তু ধর্মেরও দুইটী দিক্ আছে। একটী ভাবের দিক্, আর একটী ক্রিয়ার দিক্। ধর্মসম্বন্ধীয় ক্রিয়া-পালনের উদ্দেশ্য মানবের পারমার্থিক উন্নতি। জড়জগতের উন্নতি বা বৈষয়িক উন্নতিতে মানবের সম্পূর্ণ চরিতার্থতা হয় না; সুতরাং তাহার পারমার্থিক উন্নতিরও প্রয়োজন আছে। মানবের ধর্মের কিছু বৈশিষ্ট আছে। ধর্মের বৈশিষ্ট্য মানবের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে। মানবের ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধ আছে, সুতরাং মানব-মন চিরকালই ঈশ্বরের দিকে আকৃষ্ট। ঈশ্বর আছেন জানিয়াই মানব চরিতার্থ হয় না; ঈশ্বরের সঙ্গে আত্মার সংযোগ-সাধনে মানবের চেষ্টা আছে। সেই চেষ্টাই সকল ধর্মানুষ্ঠানের মূলীভূত কারণ। মানবের স্বাভাবিক

আচার-ব্যবহার নিরর্থক নহে। তাহার স্বাভাবিক ধর্মবিশ্বাস জ্ঞান-মুলক ও বুদ্ধিগম্য। আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে, কুসংস্কারাপন্ন হইয়া মানবের সেই স্বাভাবিক ধর্মাচার ও বিশ্বাস বিকৃতি-প্রাপ্ত হয়।

উপাসনার উদ্ভব কোথা হইতে কেমন করিয়া হইল? মানব-মনে একটা নির্ভরের ভাব চিরকালই আছে। মানব জানে, সকল কার্য তাহার সাধ্যায়াত্ত নহে। আর একটা শক্তির উপর তাহার শুভাশুভ নির্ভর করে। অনেক বিষয়ে মানুষ মানুষের মুখাপেক্ষী হইতে পারে, কিন্তু সকল বিষয়ে সে তাহা পারে না। একটা শক্তি আছে যাহা দ্বারা জগৎ চলিতেছে, যাহা সকল কিছু করিতে সমর্থ। মানুষ স্বভাবতঃ সম্ভ্রম ও ভক্তিমিশ্রিত ভাবে তাহার দিকে চাহিয়া থাকে। মানব সেই শক্তির উপর নির্ভরশীল হইয়া যে ভাবের দ্বারা প্রণোদিত হয়, তাহাই উপাসনা-প্রবৃত্তির উত্তেজক। সকল জাতির প্রাথমিক চরিত্র বিশ্লেষণ করিলে, এই সাধারণ প্রবৃত্তির সন্ধান পাওয়া যায়। সর্বপ্রথমে মানব সেই শক্তিকে নানা আকারে নানা ভাগে বিভক্ত অবস্থায় দেখে, কিন্তু ক্রমশঃ তাহা 'যে একই শক্তি নানা আকারে প্রতীয়মান ও ক্রিয়াশীল, তাহা সে বুঝিতে পারে। মানবের প্রাথমিক অবস্থার এই স্বাভাবিক ভাব অতি পবিত্র। কিন্তু যখন মানব সেই শক্তিকে তুষ্ট বা বাধ্য করিবার জন্য নানা প্রকার উপায় উদ্ভাবন করিবার প্রয়াস পায়, তখনই মানবের এই পবিত্র ভাব কলুষিত হইয়া তাঁহার স্বাভাবিক উপাসনা-পদ্ধতি বিকৃত ও অবনত হয়। মানুষ বহুকাল ধরিয়া আপনার অনুকুলে ও শত্রুর প্রতিকূলে দেবতাকে বাধ্য করিবার চেষ্টা পাইয়া আসিয়াছে। প্রয়োজন-বিশেষে দেবতার ক্রোধশান্তি ও প্রয়োজন-বিশেষে তাঁহার ক্রোধোদ্রেক করিবার জন্য মানব নানা উপায় অবলম্বনও করিয়া আসিয়াছে। পৃথিবীর নানা দেশের নানা প্রকার ধর্মানুষ্ঠান এই সকল চেষ্টার ফল। যদি মানব-জাতির প্রকৃতির মূলে অলৌকিক

ক্ষমতাবিশিষ্ট কোন দেবের অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাস না থাকিত তাহা হইলে কোন প্রকার অনুষ্ঠান পৃথিবীর কোন অংশে বহুকাল ধরিয়া প্রশ্রয় পাইতে পারিত না। পণ্ডিতেরা নিরূপণ করিয়াছেন—সকল মানব এক গূঢ় সম্বন্ধে পরস্পর আবদ্ধ ও সচরাচর বহু মানব একটী মানবের দ্বারা পরিচালিত হইয়া আসিয়াছে। কোন জাতির মানবের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ, তাঁহার মনের ভাব, সেই সমগ্র জাতির মনের ভাব। একজন প্রতীচ্য মনীষী বলিয়া গিয়াছেন যে, কোন জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ মানবের মধ্যে অনুসন্ধান করিলে সমগ্র জাতিটীর মনের ভাব জানিতে ও সেই জাতিটীকে চিনিতে পারা যায়। শ্রেষ্ঠ মানবের ভাব ও জ্ঞান সমগ্র জাতির মধ্যে সঞ্চারিত হয়। শ্রেষ্ঠ-মানবসকল ঈশ্বরের ভাব ও জ্ঞান সঞ্চালনের প্রণালী। প্রথমে একটী মানুষ জ্ঞানী হয়, তার পর সকল মানুষ সেই জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে। শ্রুতি শ্রেষ্ঠ মানব-সকলের সঞ্চিত জ্ঞানরাশি। প্রাচীন আর্য হিন্দুরা শ্রুতি বিস্মৃত হইতে সাহস করিতেন না। শ্রুতি-লোপ বিশেষ দুর্দৈব বলিয়া তাঁহারা মনে করিতেন। সকল জাতিরই tradition আছে। সকল জাতিরই বিশ্বাস, তাহা ঈশ্বরের বাণী।

লক্ষ্মী

লক্ষ্মীপূজা হিন্দুর একটী বিশিষ্ট পূজা। লক্ষ্মীদেবী বরাবর হিন্দুগৃহে পূজিতা হইয়া আসিতেছেন। প্রতি গৃহে লক্ষ্মীপূজার বিধি আছে। গৃহই লক্ষ্মীর মন্দির, কাজেই লক্ষ্মীর আর স্বতন্ত্র মন্দিরের প্রয়োজন হয় নাই। সুতরাং লক্ষ্মীদেবীর পৃথক্ মন্দির আমাদের দেশে দেখিতে পাওয়া যায় না। অবশ্য মন্দিরে অন্য দেবতার সহিত লক্ষ্মী বিরাজিতা থাকিবার কোন বাধা নাই।

লক্ষ্মীর অনেক নাম—শ্রী, পদ্মা, পদ্মালয়া, হরিপ্রিয়া, ইন্দিরা, মা, লোকমাতা, ক্ষীরাব্ধিতনয়া, রমা ইত্যাদি। এই নামগুলির মধ্যে শ্রী ও লক্ষ্মী * সকলের চেয়ে পুরাতন।

ঋগ্বেদে শ্রী শব্দের প্রয়োগ আছে। লক্ষ্মী শব্দেরও প্রয়োগ আছে। কিন্তু কোথাও এ দুইটী শব্দ সৌভাগ্যদেবী অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই। ঋগ্বেদে শ্রী শব্দের প্রয়োগ অন্ততঃ ৮১ বার আছে। এই সমস্ত জায়গায় শ্রী বলিতে 'শোভা' বা 'শোভাময়', সৌন্দর্য' বা 'সৌন্দর্যময়' বুঝাইয়াছে। কোথাও 'শ্রী' বিশেষ্য, কোথাও বা বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। এ ছাড়া ক্রিয়াহিসাবে 'শ্রী'র প্রয়োগ অন্ততঃ ২১ বার আছে। ম্যাকডোনেল ও কীথ তাঁহাদের সযত্ন সঙ্কলিত 'বৈদিক সূচী'তে (Vedic Index'এ) বলিয়াছেন—ঋগ্বেদে, 'শ্রী' শব্দের অর্থ 'prosperity' এবং ইহার প্রয়োগ

---

* লক্ষ্মী সম্বন্ধে কয়েকজন পণ্ডিত অল্প-বিস্তর আলোচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে কৃষ্ণশাস্ত্রী, আনন্দকুমার স্বামী, হপ্‌কিন্স্, স্বর্গত গোপীনাথ রাও প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। বর্তমান প্রবন্ধে প্রয়োজনানুসারে স্থানে স্থানে তাঁহাদের সংগৃহীত উপকরণ হইতে কিছু কিছু সাহায্য লইয়াছি। এজন্য তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ।

ঋগ্বেদে মাত্র একবার। এই একটী মাত্র প্রয়োগ তাঁহারা পাইয়াছেন অষ্টম মণ্ডলের দ্বিতীয় সূক্তের উনবিংশ [? বিংশ] ঋকে। এই ঋক্‌টীতে আছে "অশ্রীর ইব জামাতা।" ইহার অর্থ 'কুৎসিত জামাতার ন্যায়'—'দরিদ্র জামাতার ন্যায়' নয়। † দিবাভাগে জামাই কেন শ্বশুরবাড়ী যায় না, সন্ধ্যার পরই যায়, প্রসঙ্গ দেখিলে বোঝা যায় কুরূপই তাহার কারণ। দারিদ্র্য নয়। শ্রীশব্দের বহুল প্রয়োগের মধ্যে দুই পাঁচ জায়গায় শোভা-সৌন্দর্যের সঙ্গে ধনৈশ্বর্যের যে সম্পর্ক নাই তাহা নয়, তবে এখানকার অর্থ—দেখিতে কুৎসিত। ক্রিয়া হিসাবে 'শ্রীণীহি' (৮.২.১১), শ্রীণন্তি (১.৮৪.১১ ; ৮.৬৯৩ ; ৯.৮৫ ; ৯.৯৩.৩) প্রভৃতির প্রয়োগ আছে ; 'শ্রী'ধাতু-নিষ্পন্ন 'শ্রীতঃ' (৮.৮২.৫) ও 'শ্রীতাঃ' (৮.৮২.৫) আছে। এই সমস্ত স্থানে 'শ্রী' ধাতুর অর্থ সোমের সহিত দুগ্ধ সংমিশ্রণ করা, বৈদিক পরিভাষায় ইহাকে 'অভিষবণ' করা বলে।

তবে ঋগ্বেদে 'লক্ষ্মী' শব্দের প্রয়োগ একবার মাত্রই আছে ; আর সেখানে তিনি সৌভাগ্যদেবীও নন। ঋগ্বেদ বলেন—

"ভদ্রৈষাং লক্ষ্মীর্নিহিতাধি বাচি"—১০.৭১.২

'তাঁহাদের বাক্যে [বাক্য-রচনায়] অতি চমৎকার লক্ষ্মী নিহিত আছে'। এ লক্ষ্মীর অর্থ দেবী নয়, অন্যরূপ।

পাপিলক্ষ্মী—পুণ্যা লক্ষ্মী

অথর্ববেদে সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যবতী রমণীকে 'লক্ষ্মী' বলা হইয়াছে। লক্ষ্মী কখন ভাল, কখন মন্দ। অথর্ববেদ (৭.১১৫.১) লক্ষ্মীকে 'পাপিলক্ষ্মী' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন—

---

† ন শ্রীরশ্রীঃ। তদস্যাস্তীত্যশ্রীরঃ। মত্বর্থীয়ো রঃ। গুণৈর্বিহীন কুৎসিতো জামাতা।—সায়ণ।

'প্র পতেতঃ পাপি লক্ষ্মি নশ্যেতঃ প্রামুতঃ পত।'

এই বেদে (৭.১১৫.৪) 'পুণ্যা লক্ষ্মী'ও আছেন—

"রমন্তাং পুণ্যা লক্ষ্মীর্যাঃ পাপীস্তা অনীনশম্'
'অপ ক্রামতি সুনৃতা বীর্যং পুণ্যা লক্ষ্মীঃ'

—১২.৫.৬

শতপথ ব্রাহ্মণেও (৮'৪.৪.১১ ; ৮'৫.৪.৩) লক্ষ্মীকে 'পুণ্যা লক্ষ্মী' বলা হইয়াছে। ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে সর্বপ্রথম শ্রীকে শরীরিণী রূপে দেখিতে পাই। শতপথ ব্রাহ্মণে (১১.৪.৩.১) শ্রী প্রজাপতি হইতে সঞ্জাত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

"প্রজাপতির্বৈ প্রজাঃসৃজমানোঽতপ্যত। তস্মাচ্ছ্রান্তাত্তেপানাচ্ছ্রীরুদক্রামৎসা দীপ্যমানা ভ্রাজমানা লেলায়ন্ত্যতিষ্ঠত্তাং দীপ্যমানাং ভ্রাজমানাং লেলায়ন্তীং দেবা অভ্যব্যাষান্।"

প্রজাপতি প্রজাসৃষ্টির জন্য তপ করিলেন। তিনি তপঃশ্রান্ত হইলে শ্রী সঞ্জাত হইলেন।

কম্পমানা শ্রীর জ্যোতিষ্মতী মূর্তি দেখিয়া তাঁহাকে পাইবার জন্য দেবতাদের লোভ হয়। তাঁহারা প্রজাপতির নিকট প্রস্তাব করেন যে, তাঁহারা শ্রীকে মারিয়া তাঁহার দানগুলি আত্মসাৎ করিতে চান। প্রজাপতি বলিলেন,—পুরুষ সাধারণতঃ স্ত্রীলোককে মারে না, শ্রীকে প্রাণে না মারিয়া তাঁহার দানগুলি তিনি লইতে বলেন। ফলে অগ্নি তাহার অন্ন, সোম—রাজ্য, বরুণ—সাম্রাজ্য, মিত্র—ক্ষত্র, ইন্দ্র—বল, বৃহস্পতি—ব্রহ্মবর্চস, সবিতা—রাষ্ট্র, পুষা—ভগ, সরস্বতী—পুষ্টি, ত্বষ্টা—রূপ লইলেন (শতপথ ব্রাহ্মণ ১১৪.৩.৪)। শ্রী বলিলেন, প্রজাপতি, আমার সকলই ইহারা লইল। প্রজাপতি বলিলেন, 'যজ্ঞেনৈনান্ পুনর্যাচস্ব'—যজ্ঞে তুমি এগুলি ফিরাইয়া পাইবে। শ্রী সফলকামা হইলেন।

যজুর্বেদে শ্রী দেবীরূপে কথিত হইয়াছেন। ইহাতে তাঁহার রূপের কোন উল্লেখ নাই। সংহিতা-গ্রন্থে শ্রী ও লক্ষ্মী উভয়েরই

উল্লেখ আছে। তাঁহাদের আকৃতির কোন :বর্ণনা সংহিতাতে না থাকিলেও তাঁহারা যে শরীরিণী তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু তাঁহারা তখন অভিন্ন ছিলেন না। বাজসনেয়ী সংহিতাতে (৩১.২২ ! লক্ষ্মী ও শ্রীকে আদিত্যের পত্নীদ্বয় করা হইয়াছে। তৈত্তিরীয় সংহিতায়ও লক্ষ্মী ও শ্রী আদিত্যের দুই স্ত্রী।

অতঃপর পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে সুলক্ষণ হিসাবে শ্রী-লক্ষ্মী-র উল্লেখ একত্র দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীসূক্তে শ্রী ও লক্ষ্মী অভিন্ন দেবতা। শ্রীসূক্তের পাঠের এত গণ্ডগোল যে, শ্রীসূক্তের কাল-নির্ণয় অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। তবে শ্রীসূক্ত যে বৌদ্ধযুগের বহু পূর্ববর্তী গ্রন্থ তাহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়। এই শ্রীসূক্তে সর্বপ্রথম পদ্মের সহিত শ্রী বা লক্ষ্মীর সম্পর্ক। ইহার পূর্বে কোথাও পদ্মের সহিত শ্রীর সম্বন্ধ নাই। শ্রীসূক্তে তিনি 'পদ্মস্থিতা' এবং পদ্মের উপর দণ্ডায়মানা।

শ্রী ও লক্ষ্মী পূর্বে এক দেবতা ছিলেন না। সূত্রগ্রন্থের কাল পর্যন্ত শ্রী ও লক্ষ্মী পৃথক্ দেবতা ছিলেন। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (১০.৩৫) পাই "শ্রিয়ং আবাহয়ামি গায়ত্র্যা।" শাঙ্খ্যায়ন-গৃহ্যসূত্রেও (২.১৪) তাহাই প্রতিধ্বনিত করিয়াছে। বৌধায়ন-ধর্মসূত্রেও (২.৫.৯.১০) আছে—"শ্রিয়ং দেবীং তর্পয়ামি।"

বাজসনেয়ী সংহিতাতে (৩১.২২) শ্রী ও লক্ষ্মীকে একত্র দেখিতে পাওয়া যায়। তখনও তাঁহারা অভিন্ন নন। বৈদিক সাহিত্যে শ্রীকে অগ্নির সহিত দেখা যায় (১.৭২.১০ ; ২.১.১২ ; ৮.৩ ; ১০.১)। বাজসনেয়ী সংহিতা (৩১.২২ ; ৩৯.৪), তৈত্তিরীয় সংহিতা (১.৫.২), তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ (২-৪.৬.৬), শতপথ ব্রাহ্মণ (১৪-৩.২.১৯ ইত্যাদি), বৌধায়ন-ধর্মসূত্র (২-৫৯.১০), মহানারায়ণ-উপনিষৎ (৩৫.২), হিরণ্যকেশি-গৃহ্য-সংহিতা, (১.১১.১) পারস্কর গৃহ্যসূত্র (২.১৭.১৩), গোভিল গৃহ্যসূত্র (৪.২.২৭) ও শক্তি-উপনিষদে শ্রী সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা আছে। শ্রীর নিকট বলির কথা

শাঙ্খায়ন-গৃহ্যসূত্রে (২.১৪.১০ ইত্যাদি) আছে। শাঙ্খায়ন-মতে শয্যার শিরোদেশে শ্রীর নিকট, পাদদেশে ভদ্রকালীর নিকট, গুহে সর্বান্নভূতির নিকট বলিদানের বিধি (শাঙ্খায়ন গৃহ্যসূত্র ২.১৪.১০. ইত্যাদি)। ইহা হইতেই সম্ভবতঃ মনুসংহিতায় (৩.৮৯) লক্ষ্মীর নিকট বলির সূচনা হইয়া থাকিবে। মনুও তাই বলিয়াছেন—

"উচ্ছীর্ষকে শ্রিয়ৈ কুর্যাদ্ভদ্রকাল্যৈ চ পাদতঃ।
ব্রহ্মবাস্তোষ্পতিভ্যাস্তু বাস্তুমধ্যে বলিং হরেৎ" ॥

গৃহের উত্তর-পূর্ব কোণে 'শ্রিয়ৈ নমঃ,' দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে 'ভদ্রকাল্যৈ নমঃ' এবং গৃহমধ্যে প্রাঙ্গণে 'বাস্তোষ্পতয়ে নমঃ' বলিয়া বলি প্রদান করিবে।

শ্রীর জন্য প্রার্থনাও উপনিষদে আছে। তৈত্তিরীয়-উপনিষৎ (১.৪) উপদেশ করেন—

"বাসাংসি মম গাবশ্চ। অন্নপানে চ সর্বদা। ততো মে শ্রিয়মাবহ।"
আমার নিকট শ্রীকে আনয়ন কর,—কেন না তিনি বাস, গো ও অন্নপান আনিয়া দিয়া থাকেন।

শ্রী ও লক্ষ্মী অভিন্ন হইতে অনেক সময় লাগিয়াছিল। বৈদিক যুগ হইতে রামায়ণ মহাভারতের যুগ পর্যন্ত শ্রী ও লক্ষ্মীর সম্বন্ধে যে-সমস্ত সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় তাহাদের কয়েকটী উল্লেখ করিতেছি।

দানবগণ শ্রীকে হারাইয়া ফেলেন

আমাদের শাস্ত্রের মতে অসুরেরা দেবতাদের বড় ভাই; তাঁহারা কখনও কখনও দেবতাদের মত উদারহৃদয় ও বিক্রমশালী হইয়া থাকেন, পূজার্চনার সময়ে দেবতাদের মত তাঁহারাও শ্রদ্ধা পাইয়া থাকেন (রামায়ণ ২.২৫.১৬)। পুরাণে পাই, দানব অসুরগণ

প্রথমে ধার্মিক ছিলেন। অহঙ্কারের চরম সীমায় উপনীত হইয়া তাঁহারা পাপলিপ্ত হইয়া ওঠেন এবং সেইজন্য তাঁহারা স্বর্গ হইতে বিতাড়িত হন। এই অপরাধে শ্রী তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করেন।

শ্রী ইন্দ্রকে উপদেশ দিয়া থাকেন যে, চরিত্র-বলেই কোন কার্যে কৃতকার্য হওয়া সম্ভব; দানবগণ যখন ধার্মিক ছিলেন তখন তিনি তাঁহাদের সহিত বাস করিতেন, কিন্তু তাঁহারা যখনই দুশ্চরিত্র হইয়া উঠেন তখনই শ্রী তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিয়া যান।

সমুদ্রোত্থিত শ্রী

দেবগণ মানুষের যুদ্ধবিগ্রহে কদাচিৎ যোগদান করেন, তবে শাস্ত্রে আছে, পুরাকালে কয়েকটী যুদ্ধে তাঁহারা যোগদান করিয়াছিলেন, দেব ও দানবে যে সমুদ্র মন্থন হইয়াছিল (মহাভারত ১.১৮) তাহাতে প্রথমে চন্দ্র উঠেন, পরে শ্রী ও বারুণী, এবং সর্বশেষে স্বর্গ-বৈদ্য সুধাপাত্র লইয়া সমুদ্র হইতে উত্থিত হন (রামায়ণ)।

শ্রী স্ত্রী

মহাভারতে আছে—শ্রী স্ত্রী বলিয়া কথিত। স্বামী স্ত্রীলোকের আদর্শ দেবতা, মাতাপিতাও পুত্রকন্যাগণের নিকটে দেবতার প্রতিমূর্তি। এই সকল অতি সাধারণ বিষয়ে দৃষ্টান্ত দিবার কোন প্রয়োজন নাই। নারী নিজেই দেবত্বের প্রতিমূর্তি, সেইজন্য শ্রী স্ত্রী বলিয়া উক্ত হইয়াছেন (১৩.৪৬.১৫)।

ব্রাহ্মী শ্রী

ঋষি এবং ব্রহ্মর্ষির মধ্যে যে সামান্য পার্থক্য আছে, ব্রহ্মর্ষি এবং দেবর্ষির মধ্যেও সেই রকম অতি সামান্য পার্থক্য আছে। এই ঋষিগণকে প্রায় সর্বস্থানে দেখা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে

পারে কৃষ্ণ যখন পথ অতিক্রম করেন, তিনি পথের উভয়পার্শ্বে দেবর্ষি এবং রাজর্ষিদিগকে দেখিতে পান। তাঁহারা সাধারণ মানুষের মত পথ অতিক্রম করিতে থাকেন এবং তৎকালে তাঁহাদের সঙ্গে ব্রাহ্মী শ্রী ছিলেন।

শ্রী লক্ষ্মী বলিয়া উক্ত

দানবগণ যতদিন ধর্মপরায়ণ ছিলেন শ্রী তাঁহাদের প্রতি কৃপা-পরবশ ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা যখন চরিত্রহীন হইয়া পড়েন তখনই তাঁহারা শ্রীভ্রষ্ট হন।

রামায়ণে (১.৭৭.৩০) আছে, লক্ষ্মী অথবা শ্রী বিষ্ণুর স্ত্রী বলিয়া কথিত। শ্রী শুভ্র বস্ত্রাচ্ছাদিত হইয়া সমুদ্র হইতে উত্থিত হন এবং তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য দেব ও দানবগণ পরস্পর অসূয়া প্রদর্শন করেন। মহাভারতে (১০.৬১.৪৪ ; ৬৭.১৫৬) পাওয়া যায়, শ্রী ভাগ্যদেবী, তিনিই শ্রীকৃষ্ণের স্ত্রী রুক্মিণী এবং প্রদ্যুম্ন-জননী। লক্ষ্মীদেবী ধাতা এবং বিধাতার ভগিনী। তিনি কেবলমাত্র বিষ্ণুর সহধর্মিণী এ কথা সত্য নয়, যেহেতু তিনি ধর্মের পত্নী বলিয়াও উক্ত হইয়াছেন। লক্ষ্মী সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেন এবং যাঁহারা কর্মঠ তাঁহাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন। লক্ষ্মী পদ্ম হইতে জাত, পদ্মের ভক্ত, তিনি তাই পদ্মালয়া, পদ্মহস্তা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন (৪.১৪.১৬)।

শ্রী—ধনদাত্রী দেবী

দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্ণবৃষ্টি করেন ইহা একটী কিংবদন্তী। ধনেশ্বর কুবেরের সঙ্গেও তাঁহাকে তুলনা করিতে দেখা যায়। কুবেরের শ্রী আছে এবং এই শ্রী অর্থে 'ধনরত্ন' বুঝায়। বায়ু এবং অগ্নির

সহায়তায় মৃত্তিকা হইতে ধনরত্ন তোলা হয় এবং অগ্নি-দেবতার পূজা করিলে মনুষ্যদিগকে ধনরত্ন দান করা হয়।

শ্রী—পদ্ম

মহাভারতে (৩.২০৩.১২) আছে বিষ্ণু খুব সুন্দর এবং কমনীয়। তিনি পদ্মনাভ এবং তাঁহার সুদৃশ্য পদ্ম-নাভি হইতে ব্রহ্মার জন্ম হয়। তাঁহার ললাটের পদ্ম হইতে ধর্মের পত্নী শ্রী জন্মগ্রহণ করেন। রামায়ণ (৫.৭.১৪) বলেন, পদ্মহস্তা শ্রীর মনোহারিণী মূর্তি ধনেশ্বর কুবেরের রথে ক্ষোদিত রহিয়াছে। পদ্মহস্ত সুলক্ষণ।

লক্ষ্মী ও অলক্ষ্মী

লক্ষ্মী শান্তনুর স্ত্রী এবং ব্যাসের জননী, মহাভারতে (৫.১৪৭.১৯) এ কথাও আছে। কালী দুর্ভাগ্যের সূচনা করেন এবং অলক্ষ্মী বলিয়া কথিত। লক্ষ্মী দেবগণের নিকটে এবং অলক্ষ্মী দানবগণের নিকটে আসেন; অলক্ষ্মীর সঙ্গে সঙ্গে কালী আসেন এবং সমস্ত বস্তু ধ্বংস করিয়া ফেলেন, যুদ্ধবিগ্রহে কালী-মূর্তির আবির্ভাব হয় এবং সেইজন্যই প্রাণহানি ঘটে। যখন সদ্‌গুণরাজি বিনষ্ট হয় তখন কালীর আবির্ভাব হয়।

শ্রী ও ইন্দ্র

শ্রী ইন্দ্রের সহিত উপবিষ্টা আছেন, ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। মহাভারতে (১২.২২৮.৮৯) কিন্তু শ্রী বলেন "লক্ষ্মীতিমামাহু" তিনি লক্ষ্মী (১২.২২৫.৮), এবং সেইজন্য সুখ-সমৃদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়া তিনি পূজিতা হন।

লক্ষ্মী ও শ্রী পৃথক্ দেবতা

হ্রী, শ্রী, কীর্তি, দ্যুতি, পুষ্টি, উমা, লক্ষ্মী এবং সরস্বতী তোমাকে রক্ষা করুন, মহাভারতে (৯.৪৫.১৩) এইরূপ উক্তি আছে। ইহা

হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, লক্ষ্মী এবং শ্রীকে পৃথক্ দেবতা আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

কুবের ও লক্ষ্মী

রামায়ণে (৫.৭.১৪) কুবেরের রথে পদ্মহস্ত লক্ষ্মী সংস্থাপিতা আছেন।

কুবেরকে লক্ষ্মীর সহিত দেখা যায়, কিন্তু তখনও উভয়ের স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধ স্থাপিত হয় নাই।—মহাভারত (৩.১৬৮.১৩)।

মহাভারতে (২.১০.১৯) কুবেরের রাজসভায় লক্ষ্মীকে নল-কুবেরের সহিত দেখিতে পাওয়া যায়। কুবেরের সহিত বসুধরার মূর্তি স্থাপত্যে আছে, বসুধরাকে কেহ কেহ লক্ষ্মী নামে অভিহিত করেন।

লক্ষ্মী-পূজা

রামায়ণে বর্ণিত তপোবনে দেবদেবীর প্রতিমূর্তি দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, সত্যই দেবতার মূর্তির পূজা হইত। রাম যখন অগস্ত্য-দর্শনে গমন করেন তখন তিনি তাঁহার আশ্রমে ব্রহ্মা, অগ্নি, বিষ্ণু, মহেন্দ্র, বিবস্বান্, সোম, ভগ, কুবের, ধাতা, বিধাতা, বায়ু, বাসুকি, অনন্ত, গায়ত্রী, বসুগণ, বরুণ, কার্তিকেয় এবং ধর্ম—এই আঠারজন দেবতার মূর্তি ও আয়তন (মন্দির) দেখিতে পান। নারদ বলেন যে, তিনি নিজে এই সমস্ত দেবতার পূজা করেন এবং বরুণ, বায়ু, আদিত্য, অগ্নি, স্থাণু, স্কন্দ, লক্ষ্মী, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, বাচস্পতি, চন্দ্রমা, অপ, ক্ষিতি, এবং সরস্বতীর পূজা করিতে অপরকে উপদেশ প্রদান করেন।

রামায়ণে (১.৭৭.৩০) শ্রী বিষ্ণুর সহধর্মিণী। কখনও কখনও লক্ষ্মী শ্রীকে পৃথক্ দেবতা বলিয়া ধরা হয়। মহাভারতের (১.১৮.৩৫) মতে শ্রী শ্বেতবস্ত্রাচ্ছাদিত হইয়া সমুদ্র হইতে উত্থিত হন এবং তাঁহাকে লাভ করবার জন্য দেবাসুরে ভীষণ যুদ্ধ হয়। তিনি

সুখ-সমৃদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবী। মহাভারত বলেন, তিনিই শ্রীকৃষ্ণের সহধর্মিণী রুক্মিণী এবং প্রদ্যুম্ন জননী। যজুর্বেদে (তৈঃ সং ৭.৫.১৪.৩ ; বাজসনেয়ী সং ২৯.৬০) বিষ্ণুর পত্নী ছিলেন অদিতি। তিনি বিষ্ণু-পত্নীরূপে বলি গ্রহণ করিতেন। তিনি ছিলেন, আদিত্যের মাতা (একবার ভগিনী বলিয়াও উল্লেখ আছে), মিত্র ও বরুণের মাতা, দক্ষের মাতা বা কন্যা, দেবতাদের মাতা, রাজা ও পুত্রগণের মাতা। প্রত্যুত পৃথ্বীদেবীর ন্যায় মাতৃত্বই তাঁহার মধ্যে পরিপূর্ণরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহাকে পৃথ্বীর সহিত অভিন্ন বলা হইয়া থাকে। ধনের জন্য তাঁহার স্তুতি করা হইয়া থাকে। শ্রী বা লক্ষ্মী যখন বিষ্ণুর পত্নী হইলেন তখন এই সমস্ত ধর্মও তাঁহার প্রতি আরোপিত হইল।

লক্ষ্মীই রুক্মিণী

রুক্মিণী দেবী লক্ষ্মীর অংশ-বিশেষ।

লক্ষ্মীই দেবসেনা

স্কন্দ রুদ্রের তনয় এবং কৃত্তিকাসুত বলিয়া অভিহিত হন ; দৈত্যসেনার ভগিনী দেবসেনা তাঁহার স্ত্রী ; দেবসেনার অপর নাম লক্ষ্মী। দেবসেনাকে রক্ষা করিবার জন্য ইন্দ্র কেশীকে আহত করেন ; ইন্দ্র দেবসেনার বিবাহের জন্য চেষ্টা করেন এবং জন্মগ্রহণের ছয় দিনের মধ্যেই যখন স্কন্দ সমগ্র জগৎ জয় করেন তখন তিনি স্কন্দের হস্তে দেবসেনাকে সমর্পণ করেন। পঞ্চমী তিথিতে বৃহস্পতি এই বিবাহের মন্ত্র পাঠ করেন। শ্রী আশীর্বাদ করেন। তাই এই বিবাহের স্মারক শ্রীপঞ্চমী।

সৃষ্টি-কারণে লক্ষ্মী

কীর্তি, লক্ষ্মী, ধৃতি, মেধা, পুষ্টি, শ্রদ্ধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা, মতি ইঁহারা ধর্মের পত্নী। শম, কাম ও হর্ষ ধর্মের সন্তান, প্রাপ্তি, রতি ও নন্দ ইঁহাদের স্ত্রী। ইঁহারাই জগতের সৃষ্টির কারণ।

বিভিন্ন শাস্ত্রে লক্ষ্মী

ভূমিদেবী বিষ্ণুর দ্বিতীয়া স্ত্রী, ইহার একটী হস্তে পদ্ম এবং ইহার অপর হস্ত নিম্নদিকে অবনত, তাঁহার মস্তকে মুকুট এবং তাঁহার কৃষ্ণ কেশদাম চরণচুম্বী—তিনি একটী পদ্মের উপরে দণ্ডায়মানা। ভূমিদেবী লক্ষ্মীর নামান্তর মাত্র।

অথর্ববেদে (১১.৪) প্রজাপতির সহিত প্রাণের সাদৃশ্য দেখানো হয়। উক্ত বেদের বহুস্থানে এই প্রকার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। শতপথ ব্রাহ্মণে (১১.৪.৩) শ্রীকে সৌন্দর্য এবং সমৃদ্ধির দেবী বলিয়া প্রথমে উল্লেখ করা হইয়াছে।

পদ্ম-পুরাণের উত্তর খণ্ডের একটী অধ্যায়ে ভগবদ্-মাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে। এক অধ্যায়ে বিষ্ণুর সহস্র নাম আছে, অপর একটী অধ্যায়ে রাধার সহিত লক্ষ্মীদেবীর সাদৃশ্য দেখানো হইয়াছে। তাঁহার জন্মদিন কি ভাবে উদ্‌যাপিত হইয়াছিল তাহাও বর্ণিত হইয়াছে। নিম্নলিখিত উপাখ্যানটী প্রচলিত আছে—

"ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং শিবের মধ্যে কে বড় তাহা লইয়া ঋষিদের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়। তাঁহারা ভৃগুকে দেবতাদের কাছে পাঠান। ভৃগু প্রথমে কৈলাস-পর্বতে শিবের সহিত দেখা করিবার জন্য যান। শিব পত্নী-প্রেমে তন্ময় হইয়াছিলেন বলিয়া ঋষির সহিত কোন প্রকার বাক্যালাপ করেন নাই। এইরূপে অপমানিত হইয়া শিবকে অভিশাপ দেন যে, তিনি ব্রাহ্মণেতর জাতিকর্তৃক লিঙ্গরূপে পূজিত হইবেন। তারপর ভৃগু ব্রহ্মার নিকটে যান। সেখানে ব্রহ্মাও যথোপযুক্ত শ্রদ্ধা দেখান নাই। তারপর ভৃগু মন্দার-পর্বতে বিষ্ণুর কাছে যান। সেখানে তিনি দেখেন যে, বিষ্ণু নাগের উপরে অধিষ্ঠিত এবং লক্ষ্মী তাঁহার পদসেবা করিতেছেন।"

ব্রহ্মবৈবর্তের প্রকৃতিখণ্ডে প্রকৃতি সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা আছে। ইহাতে উল্লেখ আছে যে, প্রকৃতি কৃষ্ণের আজ্ঞায় দুর্গা,

লক্ষ্মী, সরস্বতী, সাবিত্রী এবং রাধা এই পঞ্চমূর্তিতে বিভক্ত হন।

অধ্যাত্ম-রামায়ণে অদ্বৈত এবং রামভক্তি মুক্তির পথ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। বাল্মীকি-রামায়ণের মত উক্ত গ্রন্থ সাত ভাগে বিভক্ত। তন্ত্রের ন্যায় ইহা শিব এবং উমার কথোপকথনে পরিপূর্ণ। রামকে বিষ্ণু বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে, রাবণ যে সীতাকে চুরি করিয়াছিলেন তাহা মায়ামাত্র। এই গ্রন্থের শেষে সীতার অগ্নি-পরীক্ষার সময় প্রকৃত সীতা লোকচক্ষুর গোচর হন।

পদ্ম-সংহিতায় ও লক্ষ্মী-তন্ত্রে লক্ষ্মী বিষ্ণু-নারায়ণের শক্তি এবং জগৎকারণ বলিয়া পূজিতা হইয়াছেন।*

মহানির্বাণতন্ত্রে ব্রহ্মাকে সর্বোচ্চ দেবতা বলা হইয়াছে। শাক্ত দার্শনিকগণের মতে তিনিই শক্তি। শক্তি যে শুধু স্ত্রীবাচক তাহাই নয়। শক্তিই জননী; এই শক্তিই শিবের সহধর্মিণী পার্বতী, উমা, দুর্গা, কালী; বিষ্ণুর সহধর্মিণী লক্ষ্মী এবং কৃষ্ণের সহধর্মিণী কৃষ্ণা।

রামানুজ শ্রী-সম্প্রদায় স্থাপন করেন এবং এই সম্প্রদায়ভুক্ত মানবগণ শ্রীবৈষ্ণব বলিয়া পরিচিত। এই সম্প্রদায়ের ধারণা যে, প্রভু তাঁহার সহধর্মিণী লক্ষ্মীর মধ্য দিয়া সত্য প্রকাশ করেন। রামানুজ বলিয়াছেন—"লক্ষ্মীদেবীর প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধায় আমার হৃদয় যেন পরিপূর্ণ হয়।"

রামায়ণে শ্রীকে ক্ষীরাব্ধিতনয়া নামে আখ্যাত করা হইয়াছে, কেন না তিনি সুরাসুর কর্তৃক সমুদ্র মথিত হইলে উত্থিত ফেনরাশির মধ্য হইতে অপরূপ রূপলাবণ্যবতী মূর্তিতে উত্থিত হন। পুরাণের আখ্যানসমূহ হইতে তিনি যে ভৃগু ও খ্যাতির দুহিতা এবং তিনিই যে রামের সমস্ত অবতার-কালে তাঁহার পত্নী ছিলেন, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। এই বর্ণনাগুলি সমস্তই অপেক্ষাকৃত একালের,

* Eggeling, p. 850.

কেন-না ঋগ্বেদে লক্ষ্মী শব্দের উল্লেখ দেখা গেলেও ইহা ঠিক যে সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে এরূপ নহে।

বিষ্ণুর পত্নী অথবা শক্তি-স্বরূপা লক্ষ্মীকে পীতবর্ণে চিত্রিত করা হয়, তাঁহার আসন পদ্ম বা কমল, হস্তে কখনও কমল, কখনও শঙ্খ, আবার কখনও বিষ্ণুর গদা। জন্মের সময় তাঁহার এরূপ রূপলাবণ্য ছিল যে, সমস্ত দেবতাই তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হন, পরিশেষে বিষ্ণুই তাঁহাকে লাভ করেন। শ্রী অর্থাৎ ঐশ্বর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে যে পদ্ম বা কমলা বলা হয়, তাহার কারণ পদ্ম তাঁহার অতি প্রিয়বস্তু; তিনি বরাহীও বটেন, যেহেতু বিষ্ণুর বরাহ অবতারে তিনিই শক্তি; তিনি যখন বরাহের অঙ্কে উপবেশন করিয়া থাকেন বরাহ তাঁহাকে আলিঙ্গন করেন। তিনি 'আদ্যামায়া, জগতের মাতা, তিনি নারায়ণী, বিজ্ঞানী, ইত্যাদি। কখনও তাঁহাকে ভৃগু কন্যা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে; কিন্তু দেবরাজের উপর দুর্বাসার অভিশাপের ফলে, ত্রিভুবন পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে ক্ষীরাব্ধিতলে আত্মগোপন করিতে হইয়াছিল। তাঁহার অন্তর্ধানে পৃথিবী শস্যশ্রী-শূন্যা হয়। পরে সমুদ্রমন্থনকালে তিনি অপূর্ব রূপ ধারণ করিয়া পুনরুত্থিত হন, এইরূপ প্রসিদ্ধি।

জাতি ও সম্প্রদায়ে লক্ষ্মী

বৈষ্ণবেরা লক্ষ্মীকে জগন্মাতা বলিয়া পূজা করেন; তাঁহারা বলেন, ইনি আদি মায়া। যাঁহারা বৈষ্ণবতন্ত্রে থাকিয়াও শক্তি-উপাসক, তাঁহারা ইঁহাকে অনন্তের প্রতিমূর্তি কল্পনা করিয়া পৃথক্-ভাবে পূজার্চনা করেন।

জৈনগণ পূর্বে শ্রী ও লক্ষ্মীকে পৃথক্ দেবতা বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহাদের ত্রৈলোক্য-দীপিকা-নাম-সংগ্রহণীতে আছে, জীবজগতের দক্ষিণার্ধের দেবী হইতেছেন—শ্রী, হ্রী ধৃতি; আর উত্তরার্ধের দেবী

হইতেছেন—কীর্তি, বুদ্ধি, লক্ষ্মী। বর্তমানকালে দীপালির সময় জৈনদিগের মধ্যে লক্ষ্মী-পূজার বিধি আছে। সেই সময়ে ইহারা ইহাদের হিসাবপত্রের খাতা একটী বেদীর উপর সজ্জিত করেন। পুরোহিত আসিয়া জৈনের কপালে, লেখনীতে ও খাতায় চন্দনের তিলক আঁকিয়া দিলে তিনি তাঁহার হিসাবের খাতার পাতায় পাঁচ, সাত বা নয় বার শ্রী অক্ষরটী লিখিতে থাকেন। পরে একটী রজত-মুদ্রা ঐ খাতার পাতার উপরে রাখা হয়। এই রজতমুদ্রাই লক্ষ্মী ও উহার স্থাপনাই লক্ষ্মীপূজা, এইরূপ তখন ধারণা করিয়া লওয়া হয়।

ভিলেদের আদি দেবতা লক্ষ্মী। বিশেষ বিপদ-আপদ উপস্থিত হইলে ভিলরমণীরা ইহাকে স্তুতি করিয়া থাকে।

নিম্নশ্রেণীর আগরওয়ালাদিগের জাতীয় দেবতা লক্ষ্মী।

অহোমেরা যখন ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় প্রবেশ করে; তখন তথাকার বারভূইয়ারা রাজা অরিমত্তের মন্ত্রী সমুদ্রের বংশধর বলিয়া আত্ম-পরিচয় দেয়। কথিত আছে, অরিমত্তের পুত্র রত্নসিংহ বিতাড়িত হইলে সমুদ্রই সিংহাসন অধিকার করেন। সমুদ্রের পুত্র মনোহর। এই মনোহরের কন্যা লক্ষ্মী সূর্যের ভার্যা হন। শান্তনু ও সামন্ত ইহারই দুই পুত্র।

মাদ্রাজের মাল জাতি ছয়টী পাত্র স্তূপীকৃত করিয়া লক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠা করে।

গুজরাতে লক্ষ্মী পূজায় বেশ ধুমধাম হয়। লক্ষ্মী পূজায় গুজরাতীদের অনেক আমোদ-আহ্লাদের ব্যবস্থা থাকে। ইহাদের লক্ষ্মী কিন্তু আমাদের মতন নয়। তাঁহার হস্তে বীণা থাকে। শুক্র-নীতিসারে বীণাহস্তা লক্ষ্মীর একটী ধ্যান আছে।

উত্তর ভারতের কোন কোন প্রদেশে লক্ষ্মীকে চান্দ্র-সৌরবর্ষের অধিষ্ঠাত্রী কল্পনা করা হইয়া থাকে, ঠিক যেমন দুর্গা সৌরবর্ষের

অধিষ্ঠাত্রী ; তবে এই রূপকটী কর্ণাট দেশের পণ্ডিতেরা প্রত্যাখান করিয়াছেন ; তাঁহার নামের সহিত চন্দ্রের কোনও সহযোগই ইঁহারা স্বীকার করেন না।

লক্ষ্মীর কোন মন্দির না থাকিলেও, তিনি প্রাচুর্য ও সৌভাগ্যের দেবী বলিয়া অনুরাগের সহিত সম্পূজিত হন, সুতরাং তাঁহার প্রতি অবহেলার কারণ পাওয়া যায় না। আশ্বিন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে তাঁহার পূজা হইয়া থাকে।

উত্তর-ভারতে আহীররা ইসলামধর্মে দীক্ষিত হইলে ঘোষী নাম প্রাপ্ত হয়। বোম্বাইয়ে ঘোষীরা বিবাহ ও জন্মকালে অনেক হিন্দুপ্রথা পালন করিয়া থাকে। দশহরাতে তাহারা যেমন "দেবী" পূজা করে, সেইরূপ দীপালি উৎসবে তাহারা লক্ষ্মী পূজা করে।

রোমানদের সিরিস যেমন শস্যসম্ভারের প্রতিমূর্তি বলিয়া কল্পিত ও অর্চিত হন, সেইরূপ লক্ষ্মীও আমাদের নিকট আরাধ্য দেবতা— শস্যোৎপাদনের প্রত্যেক ব্যাপারে তাঁহার নাম প্রচারিত।

বেলগাঁও প্রদেশে উনবিংশ শতকের প্রথম ভাগে মহালক্ষ্মীকে ভূমির উর্বরশক্তি বলিয়া জ্ঞান করা হইত। তখন প্রত্যেক বার বৎসর অন্তর তাঁহার উদ্দেশ্যে সমারোহে যাত্রা দেওয়া হইত। এই যাত্রায় মহিষ, ছাগ, এবং নানা পক্ষী বলি দেওয়া হইত। শেষে ভূমির উৎপাদিকা-শক্তির রক্ষাকল্পে ইহাদের রক্ত ভাতের সহিত মিশাইয়া ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে ছড়াইয়া দেওয়া হইত।

মহারাষ্ট্র কৃষকেরা এখনও তাঁহার পূজার প্রতি আস্থাহীন হয় নাই। রবিশস্য বেশ জন্মাইলেই, তাহারা তাহাদের ক্ষেত্রে গিয়া একটী বৃক্ষের নিম্নে পাঁচটী পাথর একত্র করে ও তাহার উপর সিঁন্দূরের চিহ্ন দেয় ও কিছু গমের ময়দা রাখে। এইগুলিকে তাহারা পঞ্চপাণ্ডু বলিয়া পূজা করে। বিকালে তাহারা যবনালের কয়েকটী শীর্ষ লইয়া গৃহে ফিরিয়া যায়, সঙ্গে অবশ্য একটা কাপড়

দিয়া ঘেরা প্রদীপ থাকে। ইহাই তাহাদের লক্ষ্মী। এই উৎসব অমাবস্যা তিথিতে মাসের ২৮এ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

রাজপুতনায় একটী উৎসবে লক্ষ্মীকে অন্নপূর্ণা মূর্তিরূপে অর্চনা করা হইয়া থাকে। কৃষিজীবীরা তাঁহার প্রতিমূর্তি-স্বরূপ একটী পুষ্প ও ধান্যপূর্ণ শস্যপরিমাপক 'খারী' স্থাপিত করে; আর তাঁহার প্রতিকৃতিকে সাজাইতে হইলে তাহারা পদ্মা-রূপেই সাজায়, হাতে তখন একটা পদ্ম থাকে। সমুদ্রমন্থনের সময় চৌদ্দ মণির মধ্যে লক্ষ্মীও উদ্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া তাহারা তাঁহাকে রম্ভা বলিয়া থাকে; ইহাতে একটু ভুল করা হয়। এক জল-বুদ্বুদ হইতে সমুত্থিত হইলেও তাঁহারা সমান নহেন; একজন ঐশ্বর্যের অধিষ্ঠাত্রী, অপরজন সৌন্দর্যের। লক্ষ্মী বিষ্ণুর পত্নী বলিয়া তাঁহাকে প্রলয়-পয়োধি-শয্যায় শায়িত বিষ্ণুর চরণতলে অবস্থিতা করিয়া দেখানো হয়।

ইণ্ডো-চীনের অন্তরবর্তী চম্পা একটী প্রাচীন নগরী। এই চম্পাবাসিগণ চাম নামে পরিচিত। চামদিগের ধর্মশাস্ত্রে লক্ষ্মীর স্থান অতি উচ্চে। কোচিন চীনে ইঁহার একটী প্রতিমূর্তি আছে। ইহার মস্তকে মুক্তার মুকুট, করে বলয়। ইনি চতুর্ভুজা। উপরের দুই হাতে শঙ্খচক্র, নীচেকার দুই হাতে গদা। কয়েকটী সমাধি-মন্দিরের ভিত্তিগাত্রেও ইঁহার প্রতিকৃতি দেখা যায়, পদ্মপাণি হইয়া ইনি নাগচ্ছত্রের তলে বসিয়া থাকেন।

লক্ষ্মী-মূর্তি

হিন্দু দেব-দেবী সম্বন্ধে আলোচনা করিলে জানিতে পারা যায় যে, প্রত্যেক দেবতার সঙ্গে আরও কোন-না-কোন দেবতার সম্পর্ক আছে। সৃষ্টি-কারণ ব্রহ্মার মুখে বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী বাস করেন, বিষ্ণুর সহধর্মিণী লক্ষ্মীও বাস করেন এবং তাঁহারই প্রভাবে জগতের সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়।

লক্ষ্মী এবং পৃথ্বী বিষ্ণুর দুই পত্নী ; লক্ষ্মী রক্ত-পদ্মাসীনা, চতুর্হস্তা তাঁহার উপরের দুইটী বাহুতে দুইটী পদ্ম এবং অপর দুইটী বাহুতে বরাভয় মুদ্রা। সুধালাভ করিবার উদ্দেশ্যে যখন সমুদ্রমন্থন হয় তখন তিনি উত্থিত হন। পৃথ্বীর মাত্র দুইটী হস্ত আছে—দক্ষিণ হস্তে তিনি অভয়দান করিতেছেন এবং বাম হস্তে দাড়িম্ব ফল ধারণ করিয়া থাকেন। তাঁহার বাম পদ একটী রত্ন-স্থালীর উপর প্রসারিত। যখন লক্ষ্মীদেবী বিষ্ণুর সহিত অবস্থান করেন তখন তাঁহার দুইটী হস্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

গজ-লক্ষ্মী

দুই একটী ধ্যানে চারিটী হস্তেরও উল্লেখ আছে। লক্ষ্মীর অষ্ট-রূপও শাস্ত্রে স্বীকৃত। এগুলির মধ্যে গজ-লক্ষ্মীর মূর্তিই সচরাচর প্রচলিত। তিনি চতুর্হস্তা এবং বিনায়কের ন্যায় একটী প্রস্ফুটিত পদ্মের উপরে সমাসীনা। তাঁহার দক্ষিণ হস্তে একটী পদ্ম এবং বাম হস্তে সুধা-পাত্র। দেবীর অপর দুই হস্তে বিল্ব-ফল এবং শঙ্খ। তাঁহার পশ্চাতে দুইটী হস্তী কলসী হইতে তাহাদের শুণ্ড দিয়া দেবীর মস্তকে জলবর্ষণ করিতেছে। মুদ্রায়ও এরূপ মূর্তি বিরল নহে। প্রাচীর ও স্তম্ভগাত্রেও গজ-লক্ষ্মীর মূর্তি আছে। সাঁচীতে এইরূপ একটী গজ-লক্ষ্মী আছে। দ্বি-হস্তবিশিষ্টা গজ লক্ষ্মীকে সামান্য লক্ষ্মী বলিয়া বর্ণনা করা হয়। শিল্পসারে ইঁহাকে ইন্দ্র-লক্ষ্মী বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

মহাবলিপুরমে সামান্য-লক্ষ্মীর একটী সুন্দর মূর্তি আছে। এই মূর্তির মধ্যভাগের মূর্তিটী সামান্য-লক্ষ্মীর। দেবী দ্বিভূজা, বিবসনা, সাগরোদ্ভূতা পূর্ণবিকসিতা পদ্মাসনের উপরে উপবিষ্টা। আসন ও পদ্ম-পত্র অসম্পূর্ণ বলিয়া মনে হয়। তাঁহার মস্তকাবরণ একটু অসাধারণ। কর্ণে বৃহৎ ও গোলাকার কুণ্ডল এবং অঙ্গে আভরণ। দেবীর হস্তদ্বয়ে দুইটী পদ্ম-কোরক সংস্থাপিত। চারিজন বিবসনা সহচরী তাঁহার সেবাতৎপরা।

তাঁহার উভয় পার্শ্বে দুইটী বিশালকায় হস্তী শুণ্ড দিয়া দেবীর মস্তকের উপর জল ঢালিতেছে। দেবীর দ্বিতীয়া সহচরীর হস্তে একটী পদ্ম এবং দক্ষিণ ভাগের অপর সহচরীর হস্তে চন্দন, হরিদ্রা অথবা অন্য কোন প্রকার সুগন্ধ দ্রব্য রাখিবার জন্য একটী সুদৃশ্য পাত্র। সহচরীদ্বয়ের শিরোভূষণ এবং অলঙ্কার আড়ম্বরবিহীন এবং উল্লেখযোগ্য—ইহা হইতে পবল্লযুগের পরিমার্জিত রুচির বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

বিবসনা স্ত্রীমূর্তিগুলির সহিত পল্লব-স্থাপত্যের কৃষ্ণমণ্ডলস্থ গোপীদিগের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। এ দুইটী সমসাময়িক হওয়াই সম্ভব। পদ্মারূঢ়া সুখ-সমৃদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবী, বক্ষোভারে আনতা, পদ্ম-নয়না, শ্বেতবস্ত্রাচ্ছাদিতা, হেমপাত্রজলসিক্তা, পদ্ম-হস্তা প্রভৃতি বাক্যে লক্ষ্মীদেবীর বন্দনা শ্রী-সুক্তে গীত হইয়াছে। মনীষী হ্যাভেল মহাবলিপুরমের মূর্তিটিকে "স্বর্গোত্থিতা লক্ষ্মীর মূর্তি" বলিয়া মনে করেন।

মহা-লক্ষ্মী

মহা-লক্ষ্মী অষ্টলক্ষ্মীর অপর একটী মূর্তি, তাঁহার চারিটী হস্তে পাত্র, কৌমোদকী অসি এবং শ্রীফল। মহা-লক্ষ্মীর বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁহার মস্তকে লিঙ্গ আছে। পদ্মের উপরে দণ্ডায়মানা অথবা অধিরূঢ়া, এবং বরাভয়া মূর্তি হইলে সেই মূর্তির নাম হয়—বীরলক্ষ্মী। শিল্পসারে কথিত আছে যে কোল্লাপুর-মহালক্ষ্মী ষড়্ভুজা। তাঁহার তিনটী হাতে গদা, অসি এবং মদ্যপাত্র। অষ্টভুজা বীর-লক্ষ্মীর আটটী হস্ত আছে। প্রত্যেক হস্তের কিছু-না-কিছু বৈশিষ্ট্য আছে।

জ্যেষ্ঠা-লক্ষ্মী

জ্যেষ্ঠা-লক্ষ্মী লক্ষ্মীর জ্যেষ্ঠা ভগিনী। তাঁহার এক হস্তে লৌহ-নির্মিত পদ্ম এবং অপর হস্তখানি তিনি আসনের উপরে রাখেন। কিন্তু কখনও কখনও তাঁহার উভয় হস্তে পদ্ম থাকিতে দেখা যায়।

দেবীর পদদ্বয় কথঞ্চিৎ প্রসারিত। তাঁহার দক্ষিণ দিকে একটী বৃষমুখী মূর্তি আছে। এই মূর্তিটী তাঁহার সন্তানের। জ্যেষ্ঠার বামভাগে তাঁহার রূপবতী কন্যার মূর্তি। কখনও কখনও দেবীকে রক্তবর্ণরূপে দেখিতে পাওয়া যায়, তখন তাঁহাকে রক্ত-জ্যেষ্ঠা আখ্যা দেওয়া হয়।

দেবদেবীগণের মধ্যে সরস্বতীর কেশবন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। লক্ষ্মী-দেবীর কেশবন্ধ কুন্তলা-প্রণালীতে হইয়া থাকে।

বিষ্ণুমূর্তিতে লক্ষ্মী

দক্ষিণ পার্শ্বে লক্ষ্মী এবং বাম পার্শ্বে ভূমিদেবীকে লইয়া বিষ্ণু সিংহাসনে উপবিষ্ট, এরূপ মূর্তি বিরল নহে।

যদি নারদ, কামিনী, সনক এবং সনৎকুমার প্রভৃতি মূর্তি-সংশ্লিষ্ট না থাকে তাহা হইলে বিষ্ণুকে মধ্যম শ্রেণীভুক্ত করা হয়; আর যদি ব্রহ্মা, শিব, লক্ষ্মী, ভূমিদেবী, সূর্য এবং চন্দ্র মূর্তির সহিত না থাকে তাহা হইলে তাহাকে অধম শ্রেণীভুক্ত করা হয়।

বিষ্ণুর বীরশয়ন-মূর্তিতে তাঁহার বর্ণ কৃষ্ণ; তাঁহার একটী হস্ত উপাধানের কার্য করে এবং অন্য হস্তে চক্র থাকে; বামদিকের একটী হস্তে শঙ্খ এবং আর একটী হস্ত সরলভাবে প্রসারিত থাকে। বিষ্ণুর পাদমূলে লক্ষ্মী এবং ভূমিদেবী উপবিষ্টা থাকেন।

অধম ভোগস্থানক মূর্তিতে বিষ্ণুর হস্তে চক্র এবং শঙ্খ থাকে। মধ্যভাগের বিষ্ণুর দক্ষিণ দিকে লক্ষ্মীর মূর্তি এবং বাম দিকে ভূমিদেবীর মূর্তি। লক্ষ্মীদেবীর বামহস্তে একটী পদ্ম এবং ভূমিদেবীর দক্ষিণ হস্তে একটী নীলোৎপল থাকে।

ভোগাসন-মূর্তিতে চালুক্যদের রাজধানী বাদামীতে প্রাপ্ত বিষ্ণুর মূর্তিতে বিষ্ণু 'অধিশেষ' নাগের উপরে আরূঢ় আছেন। বিষ্ণুর বামপদ প্রসারিত নয় এবং নাগের উপরে তাঁহার দক্ষিণ পদ বিন্যস্ত রহিয়াছে।

আইহোলের মন্দিরে বিষ্ণুর বীরাসন-মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। কুম্ভকোনমে বিষ্ণুর অধিশেষ নাগের উপরে উপবিষ্ট একটী মূর্তি আছে। এই মূর্তির পশ্চাতের দক্ষিণ হস্তে চক্র এবং পশ্চাতের বাম হস্তে শঙ্খ ; বামপদ নিম্নদিকে সর্পের মস্তকের উপরে প্রসারিত রহিয়াছে। দক্ষিণ হস্ত দক্ষিণ জানুর উপরে প্রসারিত এবং বাম হস্ত, বাম উরুর উপরে রহিয়াছে, বিষ্ণুর দক্ষিণ ও বাম দিকে লক্ষ্মী ও ভূমিদেবীকে উড্ডীন অবস্থায় দেখা যায়। ইহাই বীরাসন-মূর্তির অধম শ্রেণীভুক্ত।

অগ্নি পুরাণে বরাহ-বিষ্ণুর মূর্তির বেশ সুন্দর বর্ণনা আছে। ইহাতে উল্লেখ আছে, বিষ্ণুর দক্ষিণ এবং বাম হস্তে যথাক্রমে শঙ্খ ও পদ্ম অথবা লক্ষ্মী থাকিবে। বিষ্ণুর বাম হস্তে লক্ষ্মী উপবিষ্টা এবং তাঁহার পদতলে ভূমিদেবী এবং অধিশেষের মূর্তি।

বরাহ-মূর্তি শ্বেতবর্ণের এবং চতুর্হস্ত। এই চারিটী হাতের তুইটীতে শঙ্খ এবং চক্র থাকে। বরাহ-দেব সিংহাসনের উপরে উপবিষ্ট এবং বহু অলঙ্কারে সুসজ্জিত। দক্ষিণ দিকে কাঞ্চন-বর্ণের লক্ষ্মী-মূর্তি উপবিষ্টা। লক্ষ্মীর বাম হস্তে পদ্ম এবং দক্ষিণ হস্তে আসনের উপরে থাকে। যজ্ঞবরাহমূর্তির বাম দিকে কৃষ্ণবর্ণা ভূমিদেবী উপবিষ্টা থাকেন।

বরাহ-মূর্তির দক্ষিণ উরুদেশের উপর দেবী বসুমতী উপবিষ্টা থাকেন। শিল্প-শাস্ত্রে উল্লখ আছে যে, লক্ষ্মীদেবীও বরাহের পার্শ্বে উপবিষ্টা থাকেন।

কখনও কখনও গিরিজা-নরসিংহ মূর্তিকে সিংহাসনে উপবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার চারিটী হস্ত, এবং পশ্চাতের দক্ষিণ এবং বাম হস্তে যথাক্রমে চক্র এবং শঙ্খ থাকে। নরসিংহ-মূর্তির দক্ষিণ দিকে একই আসনে উপবিষ্টা লক্ষ্মীমূর্তি বিরাজিত থাকেন।

লক্ষ্মীনরসিংহ-মূর্তি পদ্মসনের উপরে উপবিষ্টা ; তাঁহার দক্ষিণ পদ নিম্নদিকে বিলম্বিত এবং বাম পদ আসনের উপরে প্রসারিত।

নারায়ণের ক্রোড়ে লক্ষ্মী উপবিষ্টা এবং তাঁহার প্রত্যেক পদ পদ্মের উপরে সংস্থিত। লক্ষ্মীর দক্ষিণ হস্ত নরসিংহের দেহ আলিঙ্গন করিয়া থাকে। এবং তাঁহার বাম হস্তে একটী পদ্ম থাকে।

'নারদ-পঞ্চরাত্রে' লক্ষ্মীকে বাসুদেবের নায়িকা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

লক্ষ্মী-নারায়ণ মূর্তি হইতে সহজেই উপলব্ধি করা যায়, নারয়ণের সহিত লক্ষ্মীদেবী থাকেন। লক্ষ্মী নারায়ণের বাম ভাগে উপবিষ্টা; তাঁহার দক্ষিণ হস্ত নারায়ণের কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া থাকে। নারায়ণের বাম হস্তও দেবীকে আলিঙ্গন করিয়া থাকে। তাঁহার বাম হস্তে পদ্ম সংস্থিত। সিদ্ধির স্বভাবত সুন্দর এবং অলঙ্কার-বিভূষিত মূর্তি চামর-হস্তে লক্ষ্মী-নারায়ণের সম্মুখে দণ্ডায়মানা। নিম্নদিকের কিঞ্চিৎ দক্ষিণে গরুড়ের মূর্তি। বিষ্ণুর জলশায়ি-মূর্তিতে সংস্কৃত শাস্ত্রের নিয়মানুসারে লক্ষ্মী বিষ্ণুর পদতলে এবং ভূমিদেবী শিরোভাগে উপবিষ্টা।

দেবী নানাভাবে পূজিতা হইয়া থাকেন। পূজা-পদ্ধতির নিয়মের তারতম্যানুসারে দেবীর বিভিন্ন নামান্তর হয়। মার্কণ্ডেয় পুরাণে উক্ত আছে—গুপ্ত-রূপী-দেবী তিন প্রকার আকার গ্রহণ করেন, যথা, লক্ষ্মী, মহাকালী এবং সরস্বতী; যথাক্রমে রজঃ সত্ত্ব এবং তমোগুণের আধার। গুপ্তরূপী দেবী মহাকালী এবং মহামারী; তিনি ধনদাত্রী লক্ষ্মী এবং যশোহারিণী অলক্ষ্মী নামেও পরিচিতা।

শিল্পরত্নে উল্লিখিত হইয়াছে, লক্ষ্মীর বর্ণ শুভ্র এবং তাঁহার বাম হস্তে পদ্ম এবং দক্ষিণ হস্তে বিল্ব-ফল. তাঁহার কণ্ঠদেশে মুক্তার হার এবং দুইজন সহচরী তাঁহাকে চামর দ্বারা ব্যজন করিতেছেন। বিষ্ণুর পার্শ্বে লক্ষ্মীদেবী থাকিলে তাঁহাকে দ্বিহস্তবিশিষ্টা দেখা যায়। কিন্তু একটী পৃথক্ মন্দিরে তাঁহার পূজা করিলে তাঁহাকে চতুর্হস্তা হইতে দেখা যায়; তখন তিনি সিংহাসনে পদ্মের উপরে অধিরূঢ়

থাকেন, তাঁহার মস্তকেও পদ্ম থাকে, কেয়ূর এবং কঙ্কণ দ্বারা তিনি বিভূষিত থাকেন।

লক্ষ্মী, সরস্বতী এবং পার্বতীকে একই দেবী বলিয়া কল্পনা করা হয়।

লক্ষ্মী-গণপতি

শক্তি-গণেশ বলিতে লক্ষ্মী-গণপতি, উচ্ছিষ্ট-গণপতি, মহা-গণপতি ঊর্ধ-গণপতি এবং পিঙ্গল-গণপতি বুঝায়। লক্ষ্মী-গণপতির আটটী হাত আছে। আটটী হাতে শুক্লপক্ষী, দাড়িম্ব, পদ্ম, স্বর্ণপাত্র, অঙ্কুশ, পাশ, কল্পকলতা এবং বাণ আছে। মন্ত্রমহোদধিতে উল্লেখ আছে, লক্ষ্মী-গণপতির তিনটী চক্ষু আছে। দুইটী হস্তে দণ্ড এবং চক্র থাকিবে এবং তিনি তৃতীয় হস্তে অভয় দান করিবেন। কিন্তু চতুর্থ হস্তে কি থাকিবে সে সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই। সম্ভবত চতুর্থ হস্ত দ্বারা গণপতি লক্ষ্মীকে আলিঙ্গন করিবেন। লক্ষ্মী-গণপতির বর্ণ স্বর্ণের মত হইবে। লক্ষ্মী-দেবীও গণেশকে আলিঙ্গন করিবেন এ কথাও উক্ত আছে।

লক্ষ্মী-গণপতির প্রস্তর-মূর্তি বিশ্বনাথ-স্বামী মন্দিরে দেখিতে পাওয়া যায়। এই মন্দির ১৪৪৬ খ্রীষ্টাব্দে পাণ্ডুদেশীয় রাজা অরিকেশরী পরাক্রম পাণ্ডবদেব কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল। মূর্তিটীও এই সময়ে স্থাপিত হইয়াছিল। এই মূর্তিটীর ছয়টী হস্তে চক্র, শঙ্খ, শূল, পরশু, দন্ত এবং পাশ আছে। অবশিষ্ট চারিটী হস্তে কি আছে তাহা ঠিক বলা যায় না গণপতির শুণ্ডে একটী পান-পাত্র আছে।

লক্ষ্মী

শ্রী বা লক্ষ্মীকে আমরা বিষ্ণুর পত্নী বলিয়াই বুঝি ; লক্ষ্মীর সহিত বিষ্ণুর এই সম্বন্ধের সন্ধান বৈদিক যুগে ছিল বলিয়া বোধ হয় না। বৈদিক সাহিত্যেও এই ধারণার কোনও মূল পাওয়া যায় না। ভারদ্বাজ সূত্রেও বিষ্ণুর সহিত লক্ষ্মীর সম্পর্কের কোনও ইঙ্গিত নাই।

তবে বৈদিক সাহিত্যের শেষের দিকে ইহার একটু আধটু আভাস পাওয়া যায়। এই সমস্ত কারণে মনে হয়, শ্রী বা লক্ষ্মীর বিষ্ণু-পত্নীর বৈদিক যুগের পরবর্তী কালের ব্যাপার। শ্রী বৈদিক যুগে ছিলেন তাহারও প্রমাণ আমরা পূর্বে দিয়াছি। তবে তাঁহার রূপের বর্ণনা কোথাও পাওয়া যায় না। ভারহুত ভাস্কর্যে 'সিরিমা দেবতা'র * প্রস্তরের একটী অতি সুন্দর ভগ্ন মূর্তি আছে। মূর্তিটী খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের। দেবীর দক্ষিণ হস্তটীর কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সিরিমা দেবতা = শ্রীমা দেবতা। সিরিমা পীবরস্তনী। ইফেসীয়দিগের ভিয়ানা দেবীর ন্যায় ইঁহার বক্ষে উৎপাদিকা শক্তির চিহ্ন বর্তমান বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়া থাকেন এবং ইঁহাকে ধনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মী বলিয়া মনে করেন। আমাদের পুরাণেও শ্রীদেবী আছেন, পৌরাণিক সৌভাগ্য-দেবী ও 'সিরিমা' কিন্তু ঠিক একই দেবতা ন'ন।

বৌদ্ধ শাস্ত্রে শ্রী = সিরী, লক্ষ্মী = লক্‌খী। প্রথম প্রথম বৌদ্ধেরা শ্রীর অর্থ করিতেন—সৌন্দর্য, শোভা, সম্পত্তি। সুত্ত-নিপাতের নালক সুত্তের অষ্টম শ্লোকে ('দদ্দল্লমানং সিরিয়া অনোমবণ্ণং') এই অর্থে ইহার প্রয়োগ আছে। অন্যত্রও আছে। সৌভাগ্য, গৌরব, সমৃদ্ধি বুঝাইতেও শ্রীর বহুল প্রয়োগ বৌদ্ধ সাহিত্যে আছে। 'রজ্জ-সিরী-দায়িকা দেবতা' বৌদ্ধগণ স্বীকার করেন। তাঁহাদের সৌভাগ্যদেবী—সিরিদেবতা। ‡ শ্রীদেবতার মূর্তির বর্ণনা বৌদ্ধ

---

* বৌদ্ধ 'শীল' গ্রন্থে 'সিরিমা'-পূজার কথা আছে।

‡ তাঁহাদের : সৌভাগ্য সিরিধর (শ্রীধর) : যে ব্রাহ্মণ সৌভাগ্য হরণ করেন তিনি—সিরিচোরব্রাহ্মণ। মর্যাদা বুঝাইতে আমরা শ্রদ্ধেয় নামের পূর্বে শ্রী বসাইয়া আরও একটু বেশী শ্রদ্ধা দেখাইয়া শ্রীপাট, শ্রীধাম, শ্রীমূর্তি, শ্রীহস্ত প্রভৃতি বলিয়া থাকি, বৌদ্ধেরা কিন্তু ঠিক তাহাই করিতেন না। তাঁহাদের শুইবার ঘর জাতিবর্ণগুণকর্ম নির্বিশেষে সিরিগব্ভ (শ্রীগর্ভ), কিন্তু শ্রীগর্ভে স্বামীস্ত্রীর বিবাদ হইলে সেই বিবাদের নাম হয় সিরিবিবাদ। আবার তোমার আমার শয্যা বা শয়ন—সয়ন, কিন্তু রাজারাজড়াদের শয়ন—সিরিসয়ন।

সাহিত্যে না থাকিলেও ভাস্কর্যে আছে। ভারহুতের মূর্তির পূর্বে শ্রীদেবতার কোনও মূর্তি কোথাও পাওয়া যায় নাই। ইহার পরে শ্রীদেবতার অনেক মূর্তি পাওয়া গিয়াছে।

তারপর সাঁচীস্তূপে স্থাপত্য-নিদর্শনের মধ্যে কমলার একটী মূর্তি আছে। এই মূর্তির অপর নাম গজলক্ষ্মী। ইনি পদ্মপীঠাসনে উপবিষ্টা। পীঠাসনটী পদ্মনালের উপর সংস্থিত। নালটী আবার একটী পদ্ম হইতে উঠিয়াছে। এই পদ্মটীর দুই পাশে দুইটী পদ্ম। তন্মধ্যে একটী পদ্মের উপর দেবী পদ্মপীঠ হইতে পা ঝুলাইয়া বসিয়া আছেন। দুইটী হাতী শুঁড় দিয়া দেবীর মাথায় জল ঢালিতেছেন। প্রত্যেক হস্তীর চারিটী চরণ পদ্মের উপর সংস্থিত। দেবীর আশে-পাশেও পদ্ম। সাঁচী স্থাপত্য-যুগের সময় হইতে বরাবর এমন কি আজ পর্যন্ত এই প্রাচীন আদর্শে গজলক্ষ্মীর মূর্তি তৈরী করা হয়। সাঁচী স্তূপের মূর্তিটীই গজলক্ষ্মীর প্রাচীনতম মূর্তি। ইলোরার কৈলাস মন্দিরেও গজলক্ষ্মীর মূর্তি আছে। দেবীর হস্তে পদ্ম এবং চারিটী হস্তী তাঁহার মস্তকে জল-সেচন করিতেছে।

মুদ্রায় লক্ষ্মী

বৌদ্ধযুগে হিন্দুদের দেব-দেবীর স্থান বড় উচ্চ ছিল না। এই যুগের দ্বিতীয় পাদে হিন্দু ধর্মের পুনরুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু দেবদেবীগণ ভাস্কর্যে স্থান লাভ করিতে লাগিলেন। খৃষ্টীয় প্রথম শতকে মুদ্রায় শিব-মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। বাসুদেব হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন; তিনি একজন পরম শৈব ছিলেন। তিনি যে মুদ্রার প্রচলন করিয়াছিলেন তাহার বিপরীত দিকে শিবের মূর্তি অঙ্কিত আছে। বাসুদেবের মৃত্যুর পর (খৃঃ ২২০) কুষাণদিগের প্রভুত্ব কমিয়া গিয়াছিল। অবশ্য কণিষ্কের বংশধরগণ ৪২৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কাবুল উপত্যকা নিজেদের অধিকারে রাখিয়াছিলেন। এই সমস্ত রাজাদের শাসনকালে প্রধানত দুই প্রকার মুদ্রা প্রচলিত

ছিল। এক প্রকার মুদ্রার বিপরীত দিকে শিবের মূর্তি ছিল ; আর এক প্রকার যে মুদ্রা ছিল তাহার উপরের দিকে সিংহাসনে লক্ষ্মী দেবীর মূর্তি বিরাজিত।

এলাহাবাদে একটী ক্ষোদিত স্তম্ভ আছে। ইহাতে যে লিপি আছে তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, সমুদ্রগুপ্তের রাজ্য উত্তরে হিমালয়, পূর্বে ব্রহ্মপুত্র, দক্ষিণে নর্মদা এবং পশ্চিমে যমুনা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দেশজয় ব্যাপার শেষ করিয়া তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। পঞ্জাবে সমুদ্রগুপ্তের অধীন রাজ্যগুলি পূর্বে কুষাণদিগের অধিকারভুক্ত ছিল। এখানে এক রকম মুদ্রা প্রচলিত ছিল, আর সেই মুদ্রায় "দণ্ডায়মান নৃপতি" ও "আসীনা দেবী"র মূর্তি অঙ্কিত থাকিত। এই সকল মুদ্রার অনুকরণে সমুদ্রগুপ্তের রাজ্যে প্রচলিত মুদ্রার প্রতিকৃতি গৃহীত হইয়াছিল। নানালঙ্কার-ভূষিতা সিংহাসনাসীনা দেবীমূর্তি সমুদ্রগুপ্তের রাজ্যকালে দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ও কুমারগুপ্তের শাসনকালে অশ্বারূঢ়া দেবীমূর্তির মুদ্রা দেখিতে পাওয়া যায়। সমুদ্রগুপ্ত ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মুদ্রায় দেবী যে ভাবে উপবিষ্টা তাহাতে ধনদা লক্ষ্মীদেবীর সমস্ত গুণই প্রকাশ পাইয়াছে। সমুদ্রগুপ্তের মুদ্রায় লক্ষ্মীদেবী সিংহাসনে উপবিষ্টা। পদ্মের উপরে তাঁহার পদদ্বয় স্থাপিত। দক্ষিণ দিকে পরাক্রমের মূর্তি। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের (খৃঃ ৩৭৫-৪১৩) রাজ্যে প্রচলিত মুদ্রার সংখ্যা যথেষ্ট ছিল। মুদ্রার উপরে লক্ষ্মীদেবী, সিংহাসনের পরিবর্তে পদ্মের উপর অধিষ্ঠিতা ; অপরদিকে লক্ষ্মীদেবী অন্যরূপ মূর্তিতে সিংহের উপরে আসীনা। সমুদ্রগুপ্তের রাজ্যে যে রকম মুদ্রা প্রচলিত ছিল প্রথম কুমারগুপ্ত ঠিক সেই রকম মুদ্রারই প্রচলন করিয়াছিলেন। তাঁহার মুদ্রার বিপরীত দিকে লক্ষ্মীদেবী ময়ূরকে আহার দান করিতেছেন এইরূপ ভাব প্রদর্শন করা হইয়াছে।

গুপ্তবংশের শেষ রাজা স্কন্দগুপ্ত ৪৫৫ খৃঃ পিতৃ সিংহাসন লাভ

করেন। তিনি এক নূতন ধরণের মুদ্রা প্রচলিত করেন। ইহার দক্ষিণ দিকে লক্ষ্মীদেবী, বাম দিকে রাজা স্কন্দগুপ্ত এবং মধ্যভাগে গরুড়। ব্রিটিশ মিউজিয়মে কতকগুলি দুর্লভ মুদ্রা সংরক্ষিত আছে, সেগুলির উপরে ক্ষোদিত মূর্তির সহিত গুপ্তরাজগণের মুদ্রাঙ্কিত মূর্তির যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে ; আর এই সাদৃশ্য এত বেশী যে, উভয় পরিকল্পনা একই বিষয় হইতে পাওয়া গিয়াছে বলিয়া মনে করাও যাইতে পারে। সমুদ্রগুপ্তের মুদ্রার পশ্চাদ্‌ভাগে ক্ষোদিত সিংহসনা-সীনা দেবীমূর্তি এবং দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যকালে প্রাপ্ত ধনুর্ধারী মূর্তি নিশ্চয়ই ইণ্ডোসিথিয়ান মুদ্রাঙ্কিত "অর্দ্রোখ্‌শো" মূর্তির পরিকল্পনা হইতে গৃহীত বলিয়া কেহ কেহ মত প্রকাশ করিয়াছেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মুদ্রার উপরে অঙ্কিত দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ ধনুর্ধারী মূর্তির সহিত প্রস্ফুটিত পদ্মের উপরে আসীনা দেবীমূর্তির কোন সাদৃশ্য নাই। শেষোক্ত দেবীমূর্তি বহু শতাব্দী ধরিয়া উত্তর-ভারতে স্বর্ণ ও তাম্রমুদ্রায় অঙ্কিত মূর্তির আদর্শ পরিকল্পনা বলিয়া গৃহীত হইত। এই মূর্তির সহিত সিংহাসনারূঢ়া দেবীর, দণ্ডায়মানা দেবীর, অথবা কাষ্ঠাসনে উপবিষ্টা দেবীর বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। সাধারণত এই সমস্ত দেবীর এক হাতে পদ্ম ও অপর হাতে পাশ থাকে। বিষ্ণুপ্রিয়া লক্ষ্মীর সহিত এই দেবীমূর্তিগুলির যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। লক্ষ্মী সৌভাগ্যদেবী, পীতবর্ণা, পদ্মাসনে উপবিষ্টা। কখনও কখনও তিনি চতুর্হস্তা ; তখন তাঁহার দক্ষিণ দিকের একটী হাতে জপমালা এবং বাম দিকের একটী হাতে পাশ থাকে ; বরুণ ও শিবের হাতেও এই প্রহরণ দেখিতে পাওয়া যায়।

গৌড়রাজ শশাঙ্কের (৬০০-৬২৫ খৃঃ) মুদ্রায় শিব নন্দীর (বৃষের) উপরে হেলিয়া রহিয়াছেন, বামদিকের উপরিভাগে চন্দ্র, দক্ষিণে শ্রীশ' নিম্নে জয়। লক্ষ্মীদেবী পদ্মোপরি উপবিষ্টা। উভয় পার্শ্বে হস্তী জল ঢালিতেছে। দক্ষিণ দিকে শ্রীশশাঙ্ক। তাম্রমুদ্রায় সাধারণত দেখিতে পাওয়া যায় যে, হস্তিদ্বয় দেবীর মস্তকে জল-সেচন

করিতেছে। ধর্মাদিত্যের তাম্রমুদ্রায় এইরূপ চিত্র দেখিতে পাওয়া যায় (A. S. R., 1903-4. vol iii, pl xl, 7, 8, 10, 11, 13 দ্রষ্টব্য)। সমুদ্রগুপ্তের তাম্রমুদ্রার সহিত ইহাদের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। ফরিদপুরে এই রকম একটী তাম্রমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। বসাড়ে ১৯১২ সালে কতকগুলি মুদ্রা পাওয়া গিয়াছিল ; তন্মধ্যে ডিম্বাকার একটী বৃহৎ ও চমৎকার মুদ্রা আছে। আয়তনে ইহা ২ "২″×২″"। ইহাতে লক্ষ্মী দেবী দুইটী হস্তীর সম্মুখে একটী নীচু বেদীর উপর দাঁড়াইয়া আছেন, আর ঐ হস্তিদ্বয় তাহাদের শুণ্ডোপরিস্থ কলসী হইতে তাঁহার মস্তকে জল-সেচন করিতেছে। দেবীর বাম ভাগে একটী বড় শঙ্খ। দক্ষিণ দিকেও কিছু আছে—কি ঠিক নির্দেশ করা কঠিন। মুদ্রাটী সম্ভবত চতুর্থ কিংবা পঞ্চম শতকের। মুদ্রার নিম্নদেশে দুই ছত্র এইরূপ অঙ্কিত আছে :

বিশালি নামকুণ্ডে কুমারা
মাত্যাধিকরণ (স্য)

পূর্ববঙ্গের ত্রিপুরা জেলায় প্রাপ্ত একটী তাম্রমুদ্রায় দুইটী সহচরীর সহিত লক্ষ্মীর মূর্তি আছে। মুদ্রাটীর পরিধি চার ইঞ্চি। সহচরীগণ গোলাকার পাত্র হইতে দেবীর মস্তকে জল-সেচন করিতেছে। বিপরীত দিকে একটী পদ্ম। তাম্রমুদ্রার ভাষা গুপ্ত রাজাদের শাসন কালের। কনৌজের হিন্দুরাজগণ লক্ষ্মী মুদ্রা প্রচলিত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অনুকরণে সুলতান মহম্মদ বিন শাম লক্ষ্মীমূর্তি-অঙ্কিত মুদ্রা প্রচলিত করিয়াছিলেন।

হিন্দুস্থান ও মধ্য-ভারতে যে সমস্ত রাজপুত নরপতি রাজত্ব করিতেন তাঁহাদের প্রচলিত মুদ্রা সাধারণত স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত ছিল। গাঙ্গেয় দেব বিক্রমাদিত্য (১০১৫-১০৪০ খৃঃ) যে মুদ্রা প্রচলিত করেন তাহাতে লক্ষ্মী চতুর্হস্তবিশিষ্টারূপে অঙ্কিত আছেন।

স্থাপত্যে লক্ষ্মী

আমাদের শাস্ত্রের উক্তি, বিষ্ণু জগত্রাতা। বিষ্ণু নানাস্থানে নানা নামে পরিচিত। দক্ষিণ ভারতে শ্রীবিষ্ণুমূর্তির পূজা মন্দির গুলিতে নানাভাবে হইয়া থাকে। তাঁহার চারিটী বাহু, তুইটী চক্ষু ; মস্তকে কিরীট এবং বক্ষে শ্রীবৎস-চিহ্ন অঙ্কিত থাকে। উপরের হাত তুটীতে শঙ্খ-চক্র এবং নীচের তুটী হাতে গদা-পদ্ম। শ্রীবিষ্ণুর কণ্ঠে আজানুবিলম্বিত বনমালা। ধনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মী তাঁহার দক্ষিণ দিকে বিরাজিতা থাকেন।

দক্ষিণ-ভারতের মন্দিরগুলিতে শ্রীবিষ্ণুর নানামূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে একটী মূর্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অনন্ত-নাগের পৃষ্ঠোপরি শ্রীবিষ্ণু নিদ্রিত, তাঁহার দক্ষিণ বাহু প্রসারিত এবং বাম বাহুটী কিঞ্চিৎ উত্তোলিত। তাঁহার মেখলা নাভির নিম্নভাগের চতুর্দিক বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে এবং তাঁহার কণ্ঠে বনমালা দক্ষিণ বাহু হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে—ইহাতে তাঁহার নিদ্রাবিষ্ট মূর্তি বেশ স্পষ্ট ধারণা করিতে পারা যায়। অনন্ত-নাগের পার্শ্বে বিষ্ণুর পদমূলে নতজানু, বিষ্ণুর পূজার্চনানিরতা লক্ষ্মীদেবীর সমুজ্জ্বল মূর্তি বিরাজিত। লক্ষ্মীর সম্মুখে নাগ-পার্শ্বে আরও তুইটী মূর্তি আছে। এই তুইটী মূর্তি ব্রহ্মা ও শিবের অথবা জয়া ও বিজয়ার বলিয়া বোধ হয়।

অনন্ত-নাগের উপরে উপবিষ্ট মূর্তির নাম বৈকুণ্ঠনারায়ণ। জানু-গ্রন্থির উপরে বাম-হস্ত এবং নাগের মস্তকের উপরে মূর্তির দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত রহিয়াছে। পশ্চাতের বাহু তুটীতে শঙ্খ এবং চক্র বিরাজমান। মূর্তিটী মণি-রত্নশোভিত এবং ইহার পার্শ্বে লক্ষ্মী এবং পৃথ্বীর মূর্তি। বিষ্ণুর লক্ষ্মী-নারায়ণ মূর্তির বামভাগে, পার্শ্বদেশে অথবা উরুর উপরে লক্ষ্মীকে উপবিষ্টা থাকিতে দেখা যায়। তাঁহার দক্ষিণ হস্ত দিয়া তিনি বিষ্ণুর কণ্ঠদেশ বেষ্টন করিয়া থাকেন এবং তাঁহার বামহস্তে পদ্ম থাকে। বিষ্ণুর দক্ষিণ হস্ত লক্ষ্মীর কটিদেশ বেষ্টিত থাকে।

পদমপুর জমিদারীতে নরসিংহনাথের মন্দির আছে। সম্বলপুর জেলায় পদমপুরের ২০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে ইহা অবস্থিত। মন্দিরটীর মুখ পূর্ব্বদিকে, ইহাতে একটী সুবৃহৎ মন্দির আছে। 'জগমোহন' মণ্ডপের প্রাচীরগুলি পুনরায় প্রস্তুত হইয়াছে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। আগে মণ্ডপটীর পূর্বে, উত্তরে এবং দক্ষিণে দ্বার ছিল, কিন্তু এক্ষণে দুইটী মাত্র দ্বার আছে, তৃতীয় দ্বারটী একেবারে রুদ্ধ। সেইজন্য পার্শ্বের প্রাচীরটী বিসদৃশ হইয়াছে। উত্তরদিকে গজলক্ষ্মীর মূর্ত্তি আছে। লক্ষ্মীদেবী পদ্মাসনের উপরে উপবিষ্টা। তাঁহার দক্ষিণ পদ সিংহাসনে এবং বাম পদ নিম্নে স্থাপিত একটী কাষ্ঠাসনের উপরে। তাঁহার উভয় পার্শ্বে চামর-ব্যজন হইতেছে এবং দুইটী হস্তী শুণ্ড দ্বারা পানপাত্র ধারণ করিয়া আছে। দক্ষিণ দিকের প্রাচীন মন্দিরের দ্বারের উপরে গজলক্ষ্মীর মূর্ত্তি আছে। ওড়িশার প্রাচীন মন্দিরে গজলক্ষ্মী দেখা যায়। কটকের প্রাচীন গুহায় এই প্রকার ভাস্কর্যের বহু নিদর্শন পাওয়া যায়।

* * * *

মন্দিরের দ্বারেও গজলক্ষ্মীর মূর্ত্তি থাকিতে দেখা যায় (Arch Sur. Rept, p 121, 122, 123)

ধর্মনাথের (ধমনারের) মন্দির বিষ্ণুকে উৎসর্গ করা হইয়াছে কি না তাহা ঠিক বলা যায় না। তবে পশ্চাতের প্রাচীরে গদা, মালা, চক্র ও শঙ্খধারী কৃষ্ণের মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। পার্শ্ব-দ্বারের উপরে বিষ্ণু এবং লক্ষ্মী আছেন। বিষ্ণুর উপরের দক্ষিণ হস্তে গদা এবং বামদিকের বাম হস্তে চক্র আছে। বাম দিকের হাতখানি লক্ষ্মীর কটিদেশ বেষ্টন করিয়াছে, দক্ষিণ দিকের হাতখানি সম্বন্ধে ঠিক কিছু বলা যায় না।

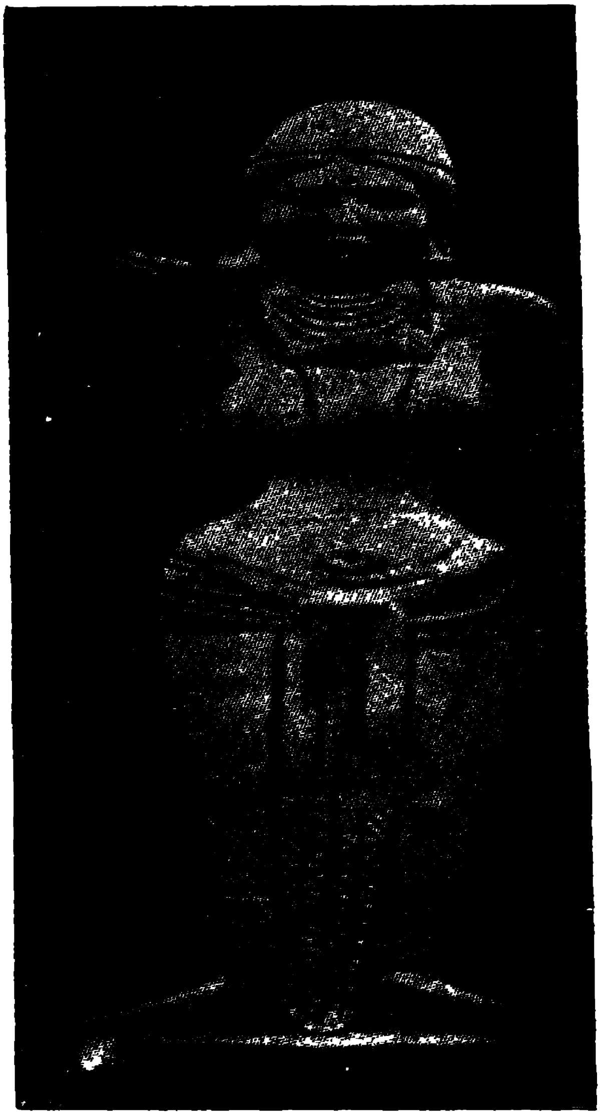
সোমপল্লীতে কয়েকটী তাম্রমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। প্রধান মূর্ত্তিটীর নাম ছিন্নকেশবস্বামী, কৃষ্ণপ্রস্তরে ইহা সুন্দরভাবে ক্ষোদিত ;

প্রতিদিন ইহার পূজার্চনা হয়। মন্দিরের পূজারীর গৃহে তিনটী তাম্রমূর্ত্তি আছে। ইহাদের মধ্যে একটী ছিন্নকেশবস্বামীর এবং অপর দুইটী লক্ষ্মী ও ভূদেবীর। কোন পর্ব্বোপলক্ষে ইহাদিগকে বাহিরে আনিয়া পূজা করা হয়। উক্ত তীর্থস্থানের উপরে ইষ্টকের একটী (অধুনালুপ্ত) চূড়া আছে। পশ্চাদ্দিকের প্রাচীরের বহির্ভাগে প্রতিমা রাখিবার জন্য একটী ক্ষুদ্র স্থানও নির্দ্দিষ্ট আছে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে একটী কমলা-মূর্ত্তি আছে। কমলা পদ্মাসনের উপরে উপবিষ্টা। তাঁহার দক্ষিণপদ বিলম্বিত অবস্থায় একটী ইন্দুরের পৃষ্ঠের উপর রহিয়াছে। দেবী একটী করণ্ড মুকুট পরিয়াছেন, তাঁহার দক্ষিণদিকের উপরের হাতে অঙ্কুশ, নিম্ন হাতে অক্ষমালা, বামদিকের উপরের হস্তে চতুষ্কোণ হীরক-খচিত বস্ত্রখণ্ড। ললাটে তিলক বেশ স্পষ্ট। তিনি কর্ণপুর, কর্ণকুণ্ডল, বলয়, কেয়ূর, নূপুর, কণ্ঠহার প্রভৃতি অলঙ্কার ধারণ করিয়াছেন। পথের উপরে দণ্ডায়মান দুইটী হস্তী শুণ্ড দ্বারা পাত্র হইতে দেবীর মস্তকের উপরে জলবর্ষণ করিতেছে।

বিষ্ণুর ত্রি-বিক্রম মূর্তিতে লক্ষ্মী দক্ষিণদিকে এবং সরস্বতী বাম দিকে দণ্ডায়মানা থাকেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে এইরূপ একটী মূর্তি আছে। ঐ মূর্তিতে লক্ষ্মী বাম হস্তে পদ্ম-নাল ধারণ করিয়া আছেন এবং সরস্বতী উভয়হস্তে বীণা লইয়া আছেন।

পরিষদে একটী চতুষ্কোণ তাম্রফলকে বেশ একটী সুন্দর ছবি দেখান হইয়াছে। ইহাতে বিষ্ণুর দশ-অবতারের মূর্তি ক্ষোদিত আছে। প্রথম চারিটী মূর্তি চতুর্হস্তবিশিষ্ট, অবশিষ্ট মূর্তিগুলি দশ-হস্তবিশিষ্ট। ধনুকহস্তে রামের মূর্তি পরশুরামের পূর্বে ক্ষোদিত রহিয়াছে। বলরামের লাঙ্গল বেশ স্পষ্টভাবে দেখান হইয়াছে। দশমাবতার কল্কি অশ্বারোহণ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত বিষ্ণু পদ্মের উপরে উপবিষ্ট এবং তাঁহার উভয় পার্শ্বে লক্ষ্মী এবং সরস্বতী। বিষ্ণুর উপরিভাগে গজলক্ষ্মী মূর্তি আছে এবং নিম্নভাগে গরুড় আছেন।



সিরিমা

একটী ছোট লক্ষ্মীর প্রতিমূর্তি আছে। দেবী চতুর্হস্তবিশিষ্ট। উপরকার দুইটী হস্তে পদ্ম আছে, নিম্নের দুইটী হস্তে তিনি বরাভয় দান করিতেছেন। দেবী কর্ণকুণ্ডল, কণ্ঠহার, বলয় পরিধান করিয়াছেন।

আইহোলের দেবালয়ের প্রবেশদ্বারে আমরা গজলক্ষ্মীকে অধিষ্ঠিত দেখি। ঐ মন্দিরের উৎসর্গলিপিতে তাঁহার বিগ্রহ প্রত্যক্ষ হয়।

জয়পুরে (কাশ্মীর) রাজা জলৌকার প্রতিষ্ঠিত একটী বড় বৌদ্ধ-বিহার ও একটী কেশবমন্দির ছিল। বৌদ্ধবিহারের কোন ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায় নাই বলিয়া মনে হয়। কেশবমন্দিরের ধ্বংসাবশেষের মধ্য হইতে একটী ক্ষোদিত শিলাফলক পাওয়া গিয়াছে। ফলকটীর দুই দিকই ক্ষোদিত এবং উভয় দিকেই লক্ষ্মী ও ভূমিদেবীর মাঝখানে চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি সহজভাবে উপবিষ্ট দেখা যায়।

একটী মূর্তিতে বিষ্ণু একানন, তাঁহার দক্ষিণপার্শ্বে পদ্মপাণি শ্রী ও বামপার্শ্বে বীণাপাণি সরস্বতী। মূর্তিটী অবন্তীপুরে পাওয়া গিয়াছে। অধুনা মথুরার প্রত্নতত্ত্বাগারে সংরক্ষিত হইয়াছে।

অবন্তীপুরে শ্রীর আর একটী মূর্তি দেখিবার জিনিস। ইহা উচ্চতায় ৮ ইঞ্চি ও প্রস্থে ৪ ইঞ্চি। দেবী, দুইটী সিংহের উপরিস্থিত আসনে সহজভাবে আসীনা, আর দুইটী হস্তী তাঁহার মাথায় বারি-পাত করিতেছে। তাঁহার সিংহাসনের সম্মুখে একটী অমৃত ঘট হইতে একটী পদ্ম উপরদিকে উঠিয়াছে। তিনি ইহার সপত্র বৃন্তটী বামহস্তে ধারণ করিয়া আছেন। তাঁহার দক্ষিণহস্তে একটী বিল্বফল দেখা যায়। অবন্তীস্বামী মন্দিরের আবিষ্কৃত শ্রীমূর্তির সহিত ইহার কিছু সাদৃশ্য আছে। কাশ্মীরের ভবনমার্তণ্ড ও ঐশ্মকাম স্থানদ্বয়ের অন্তবর্তী একটী গ্রামে ঐরূপ একটী শিলামূর্তি দেখা গিয়াছে। ফুশে বলেন বৌদ্ধদিগের কুবের পত্নী হারীতির মূর্তি হইতে এই লক্ষ্মী মূর্তির পরিকল্পনা করা হইয়াছে।

অবন্তীপুরের দেবমন্দিরে বিষ্ণু ও শ্রী ভূমিদেবীর মধ্যভাগে উপবিষ্ট আছেন দেখা যায়, আবার সিংহাসনের সম্মুখে দুইটী শুক পক্ষী আছে। এখানে বিষ্ণু কখনও চতুর্ভুজ, কখনও ষড়্‌ভুজ; কিন্তু দেবীদের প্রথামত দুইটী করিয়াই হাত আছে। আর শুক পাখীদের বিষয়ে এইটুকু বলা চলে যে, দক্ষিণ ভারতের দুর্গা ও অন্যান্য দেবীদিগের হাতে প্রায়ই শুক দেখা যায়।

সহরি বহলোলে হিন্দু দেবালয়ের অনেকগুলি ভগ্নাবশেষ আছে। তাহার মধ্যে প্রধানতঃ কয়েকটী ক্ষুদ্রায়তনের দেবমূর্তি দেখা যায়। মূর্তিগুলি সুন্দররূপে ক্ষোদিত; দেখিয়া খুব প্রাচীন বলিয়া মনে হয় না। ইহাদের মধ্যে একটী সুস্পষ্ট লক্ষ্মী-মূর্তি দেখা যায়।

ভীটায় বৈষ্ণবদিগের যে কয়েকটী মূর্তি আছে, তাহাদের মধ্যে লক্ষ্মী, গজ, শঙ্খ এবং চক্রের চিত্র পাওয়া যায়।

রংপুরে লক্ষ্মীর একটী মূর্তি দেখা যায়, তিনি পদ্মপাণি ও বিষ্ণুর দক্ষিণভাগে অবস্থিতা।

মামল্লপুরমে "বরাহ-মণ্ডপে" লক্ষ্মী-দেবীর মূর্তি আছে। তাঁহার দুইটী ভুজ। তিনি প্রথমত একটী পদ্মের উপর একটু উদ্ভট ভঙ্গীতে উপবিষ্টা। তাঁহার দুইদিকে দুইটী করিয়া সহচরী, তাঁহারা বিবসনা। ঠিক লক্ষ্মীর পার্শ্বেই যে দুইজন সহচরী আছেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই এক হাতে একটী করিয়া কলসী ধরিয়া আছেন। আর দুইজন সহচরীর বামহাতে এমন কোন জিনিস আছে, যার সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা হয় না। পশ্চাদ্দিকে দুইটী হস্তীর নিদর্শন দেখা যায়। উহাদের একটী লক্ষ্মীর দক্ষিণ পাশে তাঁহার মাথার কলসী হইতে জল-সেচন করিতেছে। অপরটী ঠিক ঐরূপ একটী কলসী লক্ষ্মীর বামদিকে অবস্থিতা একজন সহচরীর হস্ত হইতে শুণ্ডদ্বারা গ্রহণ করিতেছে।

ওসিয়ার মন্দিরটী যখন ব্যবহার হইত, তখন বহুবার ইহাতে চুনকাম পড়িয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। এই চুনকামের ফলে

এখানকার অনেক মূর্তির উপর এমন ঘন প্রলেপ পড়িয়াছে যে, তাহাদিগকে আর বুঝিবার যো নাই। প্রবেশদারের চৌকাঠের উপর গরুড়ের একটী মূর্তি আছে। তাহার উপরিভাগে নবগ্রহ; এবং উর্দ্ধে কার্ণিসের নীচে নয়টী সারিবদ্ধ কোটর বা কুলঙ্গী আছে, তাহার প্রত্যেকটীতেই কোন-না কোন মূর্তি আছে, মধ্যবর্তী কোটরের মূর্তিটী লক্ষ্মী-নারায়ণের বলিয়া প্রতীতি হয়।

সম্প্রতি মসরুরের পর্বত-ক্ষোদিত মন্দির খননকালে একটী সুন্দর লিণ্টেল আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইহাতে লক্ষ্মীর অভিষেকের একটী অতি মনোরম চিত্র আছে।

শিবের সহিত দেবীর সম্বন্ধ আছে এ কথা বহুস্থান হইতে জানিতে পারা যায়। বিষ্ণু ও ব্রহ্মার সহিত দেবীপূজার সম্বন্ধ আছে। বির সঙ্গিনীদের মধ্যে লক্ষ্মীই প্রধানা। সুধা লাভ করিবার আশায় দেবগণ যখন সমুদ্র মন্থন করেন, বহু দুর্লভ দ্রব্য সমুদ্র হইতে উঠিয়াছিল। লক্ষ্মীও সমুদ্র হইতে উত্থিত হইয়াছিলেন। ইনি পরে বিষ্ণুর পত্নী হ'ন। বিষ্ণু লক্ষ্মীকে তাঁহার পার্শ্বে স্থান দিয়াছেন। তিনি শ্রী, পদ্ম ও কমলা নামে পরিচিতা। তিনি পদ্মের উপরে উপবিষ্টা এবং তাঁহার দুই হাতে পদ্ম আছে। তিনি পদ্ম-মালাতে বিভূষিতা, তাঁহার উভয় দিকে হস্তী তাঁহার মাথায় জল ঢালিতেছে। বিষ্ণুধর্মোত্তরের মতে দেবী কৃষ্ণবর্ণা; অংশুমদ্‌ভেদাগমে তাঁহার অন্যরূপ বর্ণনা আছে। ইহাতে লক্ষ্মীর বর্ণ স্বর্ণ-হরিদ্রার মত হইবে বলিয়া উল্লেখ আছে। তিনি মণিমুক্তাখচিত স্বর্ণালঙ্কার পরিধান করেন। তাঁহার কর্ণে নক্র-কুণ্ডল। লক্ষ্মীর দৈহিক অবয়ব কুমারীর ন্যায়। তাঁহার আকৃতি মনোহর, ভ্রূ-যুগল অতীব সুন্দর, পদ্মের ন্যায় চক্ষু, মনোরম গ্রীবা এবং সুগঠিত কটিদেশ। তাঁহার মস্তকে বিবিধ অলঙ্কার, তাঁহার দক্ষিণ হস্তে পদ্ম এবং বাম হস্তে বিল্বফল। তাঁহার পৃষ্ঠদেশ বিস্তৃত এবং চিত্তাকর্ষক। কটি-মেখলায় কলা-কৌশল থাকায় স্বভাব-সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ইলোরায় গুহাভ্যন্তরে রাবণ কা খাইয়ের একটি চিত্র আছে। তাঁহাতে সপ্তমাতার মূর্তি ক্ষোদিত আছে। সপ্তমাতা, যথা—১। চামুণ্ডা—বাহন পেচক; ২। ইন্দ্রাণী—বাহন হস্তী; ৩। বরাহী—বাহন শূকর; ৪। লক্ষ্মী—বাহন গরুড়; ৫। কৌমারী—বাহন ময়ুর; ৬। মহেশ্বরী—বাহন বৃষ; ৭। ব্রাহ্মী, ব্রহ্মাণী, সরস্বতী—বাহন হংস।

পরমাশ্ব

লক্ষ্মী—বৌদ্ধদের নিকট "পরিবারসম্পত্তি" এবং "প্রজ্ঞা"; ব্যাখ্যাকারগণ বলিয়াছেন—সিরিপি 'পুঞ্ঞম্পি পঞ্ঞাপি'। তবে বৌদ্ধেরা কখন কখন হিন্দুদেবতার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদিগকে চরণতলে রাখিয়া লাঞ্ছিত করেন। তাঁহারা গণেশের, ব্রহ্মার দুর্দশা ঘটাইয়াছেন, লক্ষ্মীকেও বাদ দেন নাই।

পরমাশ্ব হয়গ্রীবের অপর একটি মুর্তি।

"প্রত্যালীঢ়েন দক্ষিণপাদৈকেন ইন্দ্রাণীং শ্রিয়ঞ্চ আক্রাম্য স্থিতম্, দ্বিতীয়দক্ষিণচরণেন রতিং প্রীতিঞ্চ, বামপ্রথমপাদেন ইন্দ্রং মধুকরঞ্চ, বামদ্বিতীয়পাদেন জয়করং বসন্তঞ্চ, ইত্যাত্মনং ধ্যায়েৎ।"

—সাধনমালা A-280, Na-32. C-217-18

তিনি প্রত্যালীঢ় মূর্তিতে দাঁড়াইয়া আছেন, দক্ষিণপদ দ্বারা ইন্দ্রাণী এবং শ্রীকে দলিত করিতেছেন এবং দ্বিতীয়পদ দ্বারা রতি এবং প্রীতিকে দলিত করিতেছেন; বামদিকের একটী পদ দ্বারা ইন্দ্র এবং মধুকরকে এবং অন্য বাম পদদ্বারা জয়কর এবং বসন্তকে দলিত করিতেছেন।

দীপ-লক্ষ্মী

দেবতাদের স্থানে দীপ দিবার রীতি আমাদের দেশে বিশেষ প্রচলিত। দীপগুলি যাহাতে কারুকার্যমণ্ডিত হয় তজ্জন্য শিল্পিগণ

বহুপ্রকার কৌশল প্রদর্শন করিয়া থাকেন। দক্ষিণ ভারতে দীপে অনেক সময়ে লক্ষ্মীদেবী মূর্ত করিয়া দেখান হয়। তখন দীপের নাম হয় দীপ-লক্ষ্মী। এই সৌন্দর্যমণ্ডিত দীপগুলি লক্ষ্মীদেবী দয়াশীলতার পরিচায়ক। উপাসকগণ মনে করেন যে, দীপগুলি দানের উপযুক্ত বস্তু। দক্ষিণ হস্তের পক্ষীটী একটী অভিনব বৈশিষ্ট্য।

কম্বোজের অন্তর্গত Ang-Pou-এর একটী শিলালিপিতে (Inscrip. of Ang Chumik 667 A. D.) ; Corpus. I. p. 67) পাওয়া যায় যে, জগতের মঙ্গলের জন্য হর ও অচ্যুত সম্মিলিত মূর্তি পরিগ্রহ করেন। ইঁহাদের পূজার্চনা সম্পূর্ণভাবে শৈব উপায়ে সম্পন্ন হয়। ভববর্মা শম্ভু-বিষ্ণুর পূজা করিয়াছেন এবং উমা, লক্ষ্মী, ভারতী, ধর্ম, মারুত এবং বিষ্ণুর উল্লেখ করিয়াছেন।

এক্ষণে যবদ্বীপের অধিবাসীগণ ইসলাম্ ধর্ম স্বীকার করিয়া থাকেন, এখানেও অনেক হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। প্রায় সকল শ্রেণীর লোক রাক্ষস, ভূত এবং বিদ্যাধরীর অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করে। এমন কি মুসলমানগণও বিশ্বাস করেন যে, লক্ষ্মী শস্য এবং সুখ-সমৃদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

হিন্দু তন্ত্রের ন্যায় তিব্বতে প্রচলিত বৌদ্ধ ধর্মেও বহু দেবদেবীর পূজা দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহাদের মধ্যে তারা সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালিনী, তাঁহার সহচরী এবং তাঁহার নিজের মূর্তির মধ্যে কোন পার্থক্য নাই, বহুগুণান্বিতা লক্ষ্মীদেবীও সেখানে পূজিত হইয়া থাকেন।

শৈবধর্মের সহিত দেবদেবীর পূজার্চনায় বিশেষ সম্বন্ধ আছে। পরবর্তী যুগের বৌদ্ধধর্মেও মাডোনার মত একটী সুন্দর মূর্তি আছে। লক্ষ্মী, সরস্বতী এবং সীতা খুবই দানশীলা, ইহা তাঁহারা বিশ্বাস করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা কাহারও শ্রদ্ধা পান না।

গণেশ

ভারতীয় প্রধান দেবগণের মধ্যে গণেশ অন্যতম। ব্রাহ্মণ্য দেবতাদের মধ্যে বরাবরই ইঁহার একটা স্থান আছে এবং সমুদয় হিন্দু দেবদেবীর মধ্যে ইনিই সর্বকাল ধরিয়া সর্বাধিক পূজিত হইয়া আসিতেছেন। ইঁহার মূর্তিও ভারতের প্রায় সর্বত্র পাওয়া গিয়াছে। ইঁহার প্রসিদ্ধি ও জনপ্রিয়তা ভারতের বাহিরেও বিস্তৃত হইয়াছিল। একদিকে নেপাল, চীন ও তুর্কীস্থান এবং অপর দিকে সমুদ্র অতিক্রম করিয়া জাভা, বলিদ্বীপ ও বোর্নিওতে তাহা বিস্তার লাভ করে। তিব্বত, বর্মা, শ্যাম, চীন, ইণ্ডোচীন ও জাপানে ইঁহার পূজা অজ্ঞাত ছিল একথাও বলা যায় না।

'গণেশ' বা 'গণপতি' অর্থে 'গণদিগের নায়ক'। গণরা যক্ষ, ইহারা শিবের অনুচর। গণরা যক্ষ হইলেও অবশ্য যক্ষগণের তালিকায় গণেশের নাম পাওয়া যায় না। তবে গণেশের আকৃতি-সম্বন্ধে একটু চিন্তা করিলেই তিনি যে যক্ষদলের একজন তাহা অনুমান করিয়া লওয়া অসঙ্গত নয়; তাঁহার বেয়াড়া বেখাপ্পা আকৃতি—আকৃতির এই অসামঞ্জস্যই তাঁহার যক্ষত্বের একটী প্রধান কারণ। তাঁহার বিপুল উদরের বৈশিষ্ট্য হইতেই তাঁহার নাম হইয়াছে 'লম্বোদর'; এই বিরাট্ উদরের সঙ্গে খর্বাকৃতি—ধ্যানে ইহাকে 'সুন্দরম্' বলিলেও আদৌ মানানসই হয় না। গণেশের বিভিন্ন নাম হইতেও বোঝা যায়, তিনি বিনায়ক ও গণদিগের অধিপতি; এই বিনায়ক ও গণ শিবের ভূত যক্ষ প্রভৃতি। শিবের গণের মুখ ও কাণ হাতী ও গরুর মত। অগ্নি-পুরাণেও (৫০°৪০) তাই দেখা যায়—'গজগোকর্ণবক্ত্রাদ্যা বীরভদ্রাদয়ো গণাঃ'। তাঁহার একটী নাম 'বিঘ্নেশ'। বিঘ্নেশ দেবতাদের

শত্রু অসুরদিগের কার্যে বিঘ্ন উৎপাদন করেন, আবার দেবতাদের যাহাতে বিঘ্ন না হয় তাহারও ব্যবস্থা করেন। শেরমান নামক জার্মান পণ্ডিত গণেশের যক্ষত্ব প্রমাণে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন; তাঁহার আলোচনা প্রণিধানযোগ্য। [১]

কোন কোন পণ্ডিতের বিশ্বাস, গণেশ দ্রবিড়-দেবতা; ভারতের সূর্যোপাসক আদিম অধিবাসিগণ-কর্তৃক তিনি পূজিত হইতেন। বাহন মূষিকের উপর উপবিষ্ট গণেশকে সূর্যদেবতার একটী প্রতীক বলিয়াও মনে করা হয়, পুরাণে ইহা রাত্রির প্রতীক। [২] অপর কয়েকজন পণ্ডিতের মতে, গণেশের হস্তিমুণ্ড ও বাহন মূষিক হইতে অনুমিত হয় যে, যদিও ভারতীয় পুরাণ হইতে তাঁহাকে পাওয়া গিয়াছে, মূলতঃ তিনি পশুসংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। [৩] এই অনুমান গ্রহণ করিবারও যুক্তি আছে। কয়েকটী মন্দিরে বিষ্ণুর পশু-অবতারসমূহের সহিত গণেশকেও পূজিত হইতে দেখা গিয়াছে; কেহ কেহ এই নিদর্শন হইতেই উক্ত যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন।

ফুশে, গেটি প্রভৃতি পণ্ডিতগণের মতে সম্ভবতঃ গণেশ প্রথমে দ্রবিড় জাতির দেবতা ছিলেন। আদি দেবমূর্তিসমূহ প্রায়ই পশু-মুণ্ডবিশিষ্ট। হস্তী ভারতের সর্ববৃহৎ ও সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান্ জন্তু, এজন্যই আদিম দেবমূর্তিতত্ত্বে হস্তীমুণ্ডের পরিকল্পনা করা হইয়াছে। ইহা হইতেই গণেশের উৎপত্তি। গণেশের দ্রবিড় নাম কি ছিল জানা যায় না। প্রাচীনতম সংস্কৃতে গণেশের নাম 'একদন্ত'। দ্রবিড় 'পল্লু ও পেল্লু' উভয় শব্দেরই অর্থ হস্তীদন্ত। [৪] সুতরাং

---

১. L. Schermann : Dickbauchtypen in der indisch ostasiatischen Goetterwelt, Jahrb. as. Knust. 1. 1924.

২. Gubernatis : Zoological Mythology, p. 68.II.

৩. W. Crooke : Popular Religion and Folklore of Northern India, Lond. 1896, 287.

৪. Przyluski : Notes sur des Villes Indiennes, tome 27, fasc. III. No. 83.

তাঁহার তামিল নাম 'পিল্লৈয়র' যে প্রাচীন গণেশের দ্রবিড় নামের অপভ্রংশ তাহা অনুমানসাপেক্ষ। 'শিশুর' তামিল নাম 'পিল্লে' এবং 'পিল্লৈয়র' অর্থে 'বড় শিশু'। আবার কাহারও কাহারও মতে, 'পিল্লে' অর্থে 'হস্তীশিশু'; কারণ পালি শব্দ 'পিল্লক'-এর সহিত 'হস্তীশিশু'র সঙ্গতি আছে।[৫]

তৈত্তিরীয়-আরণ্যকে (১০.১.৫) 'দন্তী' নামক এক দেবতার মন্ত্রে বলা হইয়াছে—'তৎপুরুষায় বিদ্মহে বক্রতুণ্ডায় ধীমহি তন্ নো দন্তীঃ প্রচোদয়াৎ'। ইহাতে উল্লিখিত 'দন্তী' নামক দেবতাকে হস্তী-মুণ্ডবিশিষ্ট গণেশ বলিয়াই অনুমান করা যায়। উল্লিখিত মন্ত্রের সহিত অন্য যে সমুদয় মন্ত্র আছে, সেগুলি কার্তিকেয় ও নন্দীর প্রতি উদ্দিষ্ট। পুরাণসমূহে প্রাচীন ভারতীয় স্থাপত্যশিল্পে কার্তিকেয় ও নন্দীর সহিত গণেশকে প্রায়ই দেখা যায়। এক্ষেত্রে দন্তীকে গণেশ বলিয়াই ধরিয়া লওয়া অসঙ্গত নয়। এতদ্ব্যতীত সায়ন তাঁহার ভাষ্যে একজন হস্তিমুণ্ডবিশিষ্ট দেবতার উল্লেখ করিয়াছেন; এই দেবতার একটী 'তুণ্ড' ('তুণ্ড' অর্থে নাসিকা, চঞ্চু বা শুঁড়) এবং উহা 'বক্র'। ইনি একটী গদা, একটী ইক্ষুদণ্ড ও রাশীকৃত শস্য বহন করেন। এগুলি গণেশের দ্রব্য হওয়াই সম্ভব, কারণ কয়েকটী শক্তি-গণপতির মূর্তিতে এগুলি দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। উক্ত দেবতা পরে পুরাণসমূহে 'বক্রতুণ্ড' নামে অভিহিত হইয়াছেন ('গণপতি-স্তোত্রে' উল্লিখিত গণেশের দ্বাদশটী নামের মধ্যে বক্রতুণ্ড অন্যতম। আবার 'মহানির্বাণতন্ত্রে' গণেশের একটী নাম 'রক্তুতুণ্ড'।[৬] 'রক্ত' বা লোহিত গণেশের স্বাভাবিক বর্ণ। বৈদিক গ্রন্থে গণেশ উল্লিখিত হইয়াছেন বটে, তবে বৈদিক দেবতাদের মধ্যে তাঁহার স্থান নাই। সম্ভবতঃ প্রাচীন ভারতে তিনি একজন অনুল্লেখযোগ্য পল্লীদেবতা

---

৫. Bagchi; 'Some Linguistic Notes'—The Indian Historical Quarterly, ix. No. 1, March. 1933.

৬. মহানির্বাণতন্ত্র Avalon-অনূদিত, পৃঃ ২৫১।

ছিলেন এবং নিম্নশ্রেণীর জাতিসমূহ তাঁহার পূজা করিত। মনুস্মৃতিতে তাঁহার নিকৃষ্টতার কিছু সন্ধানও পাওয়া গিয়াছে। মনু বলিয়াছেন—ব্রাহ্মণগণের দেবতা শিব এবং শূদ্রদিগের দেবতা গণেশ।[৭] এই শূদ্রগণকে কেহ কেহ ভারতের আদিম অধিবাসী বলিয়া মনে করিয়াছেন। *

গণেশের প্রাচীন 'একদন্ত' নাম-সম্বন্ধে কোন কাহিনীর প্রচলন নাই। প্রাচীন কৃষিকার্য ব্যাপারে অনুষ্ঠিত উৎসবসমূহে 'একদন্ত' প্রায়ই দেখা যায়। পরবর্তী যুগে একদন্ত কৃষির অনুষ্ঠাত্রী দেবতারূপে পরিগণিত হয়। সম্ভবতঃ কৃষিকার্যে ব্যবহৃত লাঙ্গলের সহিত এক-দন্তের দন্তের সঙ্গতি রক্ষা করা হইয়াছে; লাঙ্গল একদন্তেরই প্রতীক।[৮]

খ্রীস্টীয় ৬ষ্ঠ শতক পর্যন্ত হস্তিমুণ্ডবিশিষ্ট দেবতা অশিক্ষিত সম্প্রদায়সমূহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলেন। তবে পৌরাণিক দেবতাদিগের মধ্যে তাঁহার বিশেষ স্থান নাই বলিয়া আশ্চর্যের কিছুই নাই। মহাভারতের 'গণেশ' বা 'গণেশ্বর' নাম হস্তিদন্ত-বিশিষ্ট গণেশের নাম নহে, উহা তাঁহার পিতা শিবেরই একটী নাম। আবার ঋগ্বেদে (২.২৩.১) যে 'গণপতি' নামের উল্লেখ আছে তাহা ব্রাহ্মণস্পতি বা বৃহস্পতির একটী নাম। কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন, মহাভারতে 'গণেশ' বা 'গণেশ্বর' নাম শিব ও হস্তিমুণ্ড বিশিষ্ট গণেশ একই দেবতা; কারণ শিবের একটী রূপ 'রুদ্রশিব' গণদিগের নায়ক।[৯]

৭. Monier-Williams: Brahmanism and Hinduism, Lond. 1887, 212.

৮ Gupta: 'Harvest Festivals of Gauri and Ganesh'—IA xxxv. Nov. 1906.

৯ Alice Getty: Ganesa, a Monograph on the Elephant faced God, Oxford 1936, 3.

রামায়ণ ও মহাভারতে হস্তিমুণ্ডবিশিষ্ট দেবতার উল্লেখ নাই বটে, তবে শিব হইতে পৃথক্ এক জন গণেশ নামক দেবতার উল্লেখ আছে। এই গণেশ 'গণেশান' নামেও কথিত হইয়াছেন। দেবজনিত গুণাবলী তাঁহার মধ্যে দেখা যায়। এই গণেশ ব্যাসদেবের লিপিকর-রূপে কথিত হইয়াছেন। ব্যাসদেব মুখে মহাভারতের রচনা বিষয় বলিয়া যাইতেছেন, আর গণেশ অমানুষিক শক্তিদ্বারা অতি দ্রুত তাহা লিখিয়া যাইতেছেন। খ্রীস্টীয় ৯ম শতকে রচিত বালভারতের আখ্যানেও এই লিপির ব্যাপার সমর্থিত হইয়াছে। উহাতে দেখা যায়, একবার বাল্মীকির সহিত ব্যাসের সাক্ষাৎ হইলে বাল্মীকি যখন মহাভারতের রচনাকার্য কিরূপ অগ্রসর হইতেছে জিজ্ঞাসা করেন তখন ব্যাসদেব উত্তর করেন, বহু চেষ্টার পর তিনি তাঁহার 'লিপিকর-রূপে মহাগণেশকে পাইয়াছেন। Winternitz মনে করেন, খ্রীস্টীয় ৯ম শতকের পূর্বেও এই কাহিনী প্রচলিত ছিল এবং আরও দেড়শত বর্ষ পরে উত্তর-ভারতের সংশোধিত আকারের মহাভারতের এই কাহিনী সন্নিবেশিত করা হয় নাই।[১০] দক্ষিণ ভারতের মহাভারতে এই কাহিনীর কোন উল্লেখ নাই, গণেশের নামও কোথাও পাওয়া যায় না। পুরাণসমূহে গণেশের নাম প্রায়ই উল্লিখিত হইয়াছে বটে, কিন্তু গণেশকে কোথাও লিপিকররূপে দেখা যায় নাই। কোন প্রাচীন ভারতীয় মূর্তিশিল্পে বা ফ্রেস্কো-চিত্রেও এরূপ নিদর্শন পাওয়া যায় না। হস্তিমুণ্ডবিশিষ্ট গণনায়ক গণেশ ও লিপিকর গণেশ যে একই ব্যক্তি তাহারও বিশেষ কোন প্রামাণ্যের সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

অবশ্য দুইটী ক্ষুদ্র গণেশমূর্তির নিদর্শনে গণেশকে লিপিকররূপে দেখা গিয়াছে। খ্রীস্টীয় ১৩শতকে লিখিত 'পিঙ্গলমালা' নামক একটী নেপালী তান্ত্রিক পুঁথির পাটায় এইরূপ একটী গণেশের চিত্র

১০ Journal of the Royal Asiatic Society, 1898 (April,) 380.

আছে। পুঁথিটী 'নেপাল স্টেট লাইব্রেরী'তে রক্ষিত। ইহাতে হস্তিমুণ্ডবিশিষ্ট গণেশকে লিখিবার জন্য পুঁথির পাতা লইয়া উপবিষ্ট দেখা যায়। আর একটী নিদর্শন একটী রাজপুত চিত্র। এই চিত্রটী এখন Boston Museum of Fine Arts-এ রক্ষিত। ইহা খ্রীস্টীয় ১৭শ শতকে চিত্রিত। ইহাতে চতুর্হস্ত গণেশ উপাসনারত ব্যাসের সম্মুখে দণ্ডায়মান। উপরে দক্ষিণ কোণে ব্রহ্মার মূর্তি। চিত্রটীর বিষয়বস্তু এইরূপ—ব্যাসদেব যখন ব্রহ্মার ধ্যান করিতেছিলেন, তখন সহসা গণেশ তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হন। তখন ব্যাস গণেশের পূজা করেন। তাহাতে গণেশ সন্তুষ্ট হইয়া ব্যাসের লিপিকর হইতে সন্তুষ্ট হইলেন।[১১] চিত্রের নীচের দিকে গণেশকে উপবিষ্ট দেখা যায়। তাঁহার সম্মুখে একটী জলপাত্র। দক্ষিণ হস্তে তিনি অক্ষমালা গ্রহণ করিয়াছেন। উপরের দক্ষিণ হস্ত বিতর্ক মুদ্রাতেই আছে। একটী বাম হস্তে খড়্গ, অপর বাম হস্তে ব্যাসকে লিপিবদ্ধ পুঁথি প্রদান করিতেছেন। ইহা হইতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, তাঁহার লিপিকার্য শেষ হইয়াছে।

বিঘ্ন হইতে উদ্ধারকর্তৃরূপেই গণেশের প্রসিদ্ধি। কিন্তু লিপির অনুপালয়িতৃরূপে কিরূপে তাঁহার প্রসিদ্ধি হইল তাহা লইয়া মতানৈক্য আছে। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচী মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, লিপি-ব্যাপারে গণেশের সম্পর্ক 'সিদ্ধি' শব্দ হইতে জানা যায়। অতি প্রাচীনকালে ভারতীয় অক্ষরকে 'সিদ্ধম্' বলা হইত। এইজন্যই অক্ষরবিন্যাসের প্রথমেই 'সিদ্ধি' শব্দের ব্যবহার হয়। গণেশের একটী নামও আমরা 'সিদ্ধিদাতা' বলিয়া জানি। অবশ্য 'সিদ্ধিদাতা' অর্থে সাফল্যদানকারী, কিন্তু গণেশের ঐ নাম সম্ভবতঃ লিপির প্রাচীন নাম 'সিদ্ধম্' হইতেই হইয়াছে।

কেহ কেহ দেখাইতে চাহিয়াছেন যে, গণেশের জ্ঞানী বলিয়া

---

১১ A. K. Coomaraswamy: Bulletin of the Boston Museum of Fine Arts, xxvi. 30.

যে প্রসিদ্ধি আছে, তাহা হইতে বৈদিক জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বৃহস্পতির সহিত তাঁহার অভিন্নত্বের প্রশ্ন আসিয়া পড়ে।[১২] আবার কাহারও কাহারও মতে, দেবগুরু বৃহস্পতি ও গণেশ একই দেবতা।[১৩] ঋগ্বেদে গণেশ একজন বিশিষ্ট দেবতা ; তাঁহার হস্তে খড়্গাও আছে এবং তিনি 'গণপতি' নামেও কথিত হইয়াছেন। এক্ষেত্রে বৃহস্পতির সহিত গণেশের অভিন্নত্বের প্রশ্ন বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

এতৎসত্ত্বেও জ্ঞানের অনুপালয়িতৃরূপে গণেশের প্রতিষ্ঠা হয় নাই। খ্রীস্টীয় ১০ম শতকে 'গণপতি' নামক দেবতারূপে তিনি সর্বাধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এই সময় 'গাণপত্য' নামক একটী সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। ইহারা গণপতির পূজার প্রবর্তন করে। সমুদয় হিন্দু দেবদেবীকে বাদ দিয়া তাহারা এই দেবতারই পূজা সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া তোলে। ফলে একটি বিভিন্ন গণেশ-সংস্কৃতি গড়িয়া ওঠে। তখন একমাত্র গণেশেরই মন্দির নির্মিত হইতে থাকে। গনেশের সহিত তাঁহার বাহন মূষিককেও সর্বত্র দ্বারপালরূপে দেখা যাইতে লাগিল। সর্বাপেক্ষা বৃহৎ গণেশ-মন্দির নির্মিত হয় ত্রিচিনপল্লীর নিকট। ইহা একটী গুহামন্দির এবং 'উচ্চি-পিল্লৈয়র কোবিল্' নামে পরিচিত।[১৪] গাণপত্যরা একমেবাদ্বিতীয় দেবতা-রূপে গ্রহণ করে। এমন কি, গণপতি-উপনিষদে দেখা যায়, গণেশ ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবের উপরেও গৃহীত হইয়াছেন। গাণপত্যরা 'ওঁ' চিহ্নকে গণেশের প্রতীক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে।

কয়েকটী পুরাণ ও উপপুরাণে গণেশ ত্রিমূর্তিরও উপরে সৃষ্টি-কর্তার পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছেন। স্কন্দপুরাণে তাঁহাকে সাধারণ

---

১২ Bhandarkar : Vaishnavism, 149.

১৩ Gopinath Rao : Elements of Hindu Iconography' i. pt.-i, 15.

১৪ Indian Antiquary, 1877, 361.

দেবতার পর্যায়েই দেখা যায়। রমণী, ইতর জাতি, শূদ্র প্রভৃতি পাপের অনুষ্ঠানকারী শিবের ভক্তগণের অত্যাচার হইতে শান্তি-লাভের জন্য ইন্দ্র-প্রমুখ দেবতাগণের অনুরোধে শিব গণেশের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইহা হইতে গণেশের বিঘ্নেশ্বর নামের উৎপত্তি। বরাহপুরাণের একটী কাহিনীতেও এই বিষয় সমর্থিত হইয়াছে। তথায়ও শিব তাঁহাকে সৃষ্টি করিয়া সমুদয় দেবতাদিগের বিঘ্নে শান্তিস্থাপনের জন্য নিয়োজিত করিয়াছেন। আবার কোথাও কোথাও কথিত হইয়াছে, ইন্দ্রপ্রমুখ দেবতাগণের প্রার্থনায় শিবপত্নী পার্বতী গণেশের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। আবার মৎস্যপুরাণে উল্লিখিত হইয়াছে যে, পার্বতী তাঁহার স্নানকালীন গাত্রের মল ও তৈল হইতে গণেশের সৃষ্টি করেন ও গঙ্গাজল ছিটাইয়া তাঁহার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেন। এই গণেশকেই তিনি দেবতাদিগের বিঘ্ননাশের জন্য নিয়োজিত করিয়াছিলেন। পার্বতী তাঁহাকে কয়েকটী বিষয় উপদেশও দিয়া দেন। ইহার পর দেবগণ বিঘ্নাদি হইতে মুক্তি পাইয়া হৃষ্টমনে স্বর্গে গমন করেন।[১৫]

কয়েকটী কাহিনীতে আবার দেখা যায়, গণেশের সৃষ্টিব্যাপারে শিব ও পার্বতী উভয়েই অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কোন কোন ক্ষেত্রে মানবরূপী কৃষ্ণ এই গণেশেরই অবতার বলিয়া কথিত হইয়াছেন এবং মহাভারতেও কৃষ্ণকে বিঘ্নসমূহের অপসরণকারী বলিয়া অভিহিত হইতে দেখা যায়।[১৬] এই কৃষ্ণ-গণেশ-সংস্কৃতি-পন্থিগণের মধ্যে গণেশের জন্মব্যাপার লইয়া এইরূপ কাহিনী প্রচলিত আছে—পার্বতী শিবের দ্বারা নিজের কোন সন্তান-সম্ভাবনা না

---

১৫ Alice Getty : Ganesa, Oxford 1936 5-7 ; Kennedy ; Hindu Mythology 354 ; Gopinath Rao : Hindu Iconography, i. pt.-i, 43 ; Encyclopædia of Religion and Ethics, ii. Krahmanism 807.

১৬ Gopinath Rao : Hindu Iconography, i, pt.-i, 46 ; Hopkins : Epic Mythology, 207 n. 1

দেখিয়া পণ্যকব্রত অবলম্বন করিলেন। এক বৎসর ধরিয়া প্রত্যহ তিনি শিবের মন্দিরে ফল ও পুষ্পের দ্বারা শিবের পূজা করিলেন, কিন্তু তাহাতেও কিছু না হওয়ায় তিনি হতাশ হইয়া পড়েন। তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ না হওয়ায় এক দিন গভীর মনঃকষ্টে আছেন, এমন সময় তিনি দৈববাণীতে জানিলেন যে, তাঁহার পুত্র তাঁহারই আপন গৃহে অবস্থান করিতেছেন। তিনি গৃহে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, সেখানে অতি সুন্দর একটি বালক রহিয়াছে। এই সুন্দর বালককে তিনি ও শিব পুত্ররূপে গ্রহণ করিলেন। এই ব্যাপারে সমুদয় দেবগণকে একটি উৎসবে নিমন্ত্রণ করা হইল। দেবতাদের সঙ্গে শনিও অসিলেন। কিন্তু শনি বালকের মুখের প্রতি চাহিবামাত্রই ঐ বালকের মুণ্ড দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গোলোকে শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমন করিল, কারণ এই পুত্রই শ্রীকৃষ্ণের অবতার। দেবতারা আক্ষেপে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। কিন্তু বিষ্ণু শীঘ্রই গরুড়পৃষ্ঠে পুষ্পভদ্রার তীরের দিকে চলিলেন। তথায় একটি হস্তীকে উত্তর দিকে মুখ করিয়া নিদ্রিত দেখিয়া তখনই সুদর্শনচক্রদ্বারা উহার মস্তক বিচ্ছিন্ন করিয়া আনিয়া বালকের স্কন্ধে সংযোজিত করিয়া দিলেন। বালক জীবন ফিরিয়া পাইল, কিন্তু তাহার মুণ্ড হইল হস্তীর। ইনিই 'বালগণেশ' নামে প্রখ্যাত হইলেন।

কৃষ্ণ গণেশ-সংস্কৃতিপন্থিগণ গণেশকে কৃষ্ণের মতই মনে করে। এমন কি, তাহারা ভগবদ্গীতা লইয়া উহার যেখানে যেখানে কৃষ্ণের নাম আছে সেখানে সেখানে কৃষ্ণের স্থানে গণেশ বসাইয়া ভগবদ্গীতার 'গণেশগীতা' নামকরণ করিয়াছে।[১৭] একটি কাহিনী দেখা যায়, 'গণেশের' 'গজানন' নাম হওয়া সম্বন্ধে শিব বলিতেছেন যে, পার্বতী ও তিনি (শিব) ভ্রমণকালে একবার এক হস্তী ও হস্তিনীকে রমণ করিতে দেখিয়া কামপরবশ হন; তখন তাঁহারা

১৭ Dowson : Classical Dictionary of Hindu Mythology.

হস্তী ও হস্তিনীরূপ পরিগ্রহ করিয়া রমণ করায় গণেশের জন্ম হয়। এই সন্তানের মুখ হস্তিমুণ্ড হইল বলিয়া তাঁহার নাম হইল 'গজানন'।[১৮]

উক্ত কাহিনীসমূহ হইতে স্পষ্টই স্বীকৃত হয় যে, গণেশ শিব ও পার্বতী উভয়েরই সন্তান—একজনের বিশেষ ক্ষমতায় সৃষ্ট নহেন্। মাত্র যে পৌরাণিক কাহিনীসমূহেই গণেশের নাম আখ্যাত হইয়াছে তাহা নহে, ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ উভয় ধর্মেরই তন্ত্রবিদ্যাসম্পর্কীয় তত্ত্ব-বিষয়ক গ্রন্থসমূহেও তাঁহাকে দেখা যায়। এই গ্রন্থসমূহের রচনাকালের সূচনা হয় খ্রীস্টীয় ৫ম শতকে। একটি বৌদ্ধ গ্রন্থে গণেশ এক জন অসাধারণ বীর বলিয়া কথিত হইয়াছেন। তিনি মারকে জয় করিয়াছিলেন। তিনি অতুলনীয়, অপ্রতিদ্বন্দ্বী, এক জন অসাধারণ যাদুকর, মায়ামন্ত্রসমূহের রাজা এবং গুহ্যতত্ত্বসমূহে অভিজ্ঞানী। তান্ত্রিক সাধনসমূহে দেখা যায়, তাঁহার তিন চক্ষু ও বহু হস্ত এবং তাঁহার আকৃতি বা রূপ চিত্রকলা ও স্থাপত্যশিল্পে অজ্ঞাত। 'সর্বদুর্গতিপরিশোধন নামক গ্রন্থে তাঁহাকে বজ্র-গণপতি-রূপে দেখা যায়। বজ্র-গণপতি হস্তে বজ্র ও তরবারি ধারণ করেন এবং মূষকের পরিবর্তে কচ্ছপের উপর উপবেশন করেন।[১৯] তন্ত্রে প্রায়ই 'ধারণীর' (বীজমন্ত্রের) মধ্যে তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায়। একটি ধারণীতে তাঁহাকে দেবী অপরাজিতা-কর্তৃক পদদলিত হইতে দেখা গিয়াছে। গণেশের তান্ত্রিক বীজ 'গঙ্'। তন্ত্রসমূহে তাঁহার বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবেই রক্ষিত হইয়াছে। এক স্থানে দেখা যায়, তাঁহার মধ্যে তান্ত্রিক রহস্যসমূহ গুপ্ত এবং সেগুলি প্রকাশ্য নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'মহানির্বাণতন্ত্রে' দেখা যায়, আদ্যা শক্তি পার্বতী যখন শিবকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তিনি (শিব) ব্যতীত আর কে তাঁহার (শক্তির) গূঢ়তত্ত্বসমূহ জ্ঞাত আছেন, তখন শিব গণেশের নাম করিয়াছিলেন।

---

১৮ Hindu Iconography, i. pt.-i.

১৯ সর্বদুর্গতিপরিশোধন, ৭৫ পত্রাঙ্ক। Bibliotheque Nationales (Sanskrit 59)-এ রক্ষিত পুঁথি।

'শারদাতিলকে'র রাঘবভট্টের টীকায় (১. ১১৬) পঞ্চাশ রকম গণেশের নাম আছে। পঞ্চাশ গণেশের পঞ্চাশ শক্তির নামও তাহাতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহাদের মূর্তির কোন ধ্যান নাই। নিম্নে পঞ্চাশ গণেশ ও তাঁহাদের শক্তির নাম প্রদত্ত হইল—

গণেশ	ও	তাঁহার শক্তি
(১)	বিঘ্নেশ	হ্রী
(২)	বিঘ্নরাজ	শ্রী
(৩)	বিনায়ক	পুষ্টি
(৪)	শিবোত্তম	শান্তি
(৫)	বিঘ্নকৃৎ	স্বস্তি
(৬)	বিঘ্নহর্তা	সরস্বতী
(৭)	গণ	স্বাহা
(৮)	একসুদন্তক	মেধা
(৯)	দ্বিসুদন্তক	কান্তি
(১০)	গজবক্ত্র	কামিনী
(১১)	নিরঞ্জন	মোহিনী
(১২)	কপর্দী	নটী
(১৩)	দীর্ঘজীহ্বক	পার্বতী
(১৪)	শঙ্কুকর্ণ	জ্বালিনী
(১৫)	বৃষভধ্বজ	নন্দা
(১৬)	গণনায়ক	সুপশা
(১৭)	গজেন্দ্র	কামরূপিনী
(১৮)	সূর্যকর্ণ	উমা
(১৯)	ত্রিলোচন	তেজবতী
(২০)	লম্বোদর	সত্যা
(২১)	মহানন্দ	বিঘ্নেশানী
(২২)	চতুর্মূর্তি	স্বরূপিনী
(২৩)	সমাশিব	কামদা
(২৪)	আমোদ	মদজিহ্বা
(২৫)	দুর্মুখ	ভূতি

গণেশ	ও	তাঁহার শক্তি
(২৬)	সুমুখ	ভীতিকা
(২৭)	প্রমোদক	অসিতা
(২৮)	একরদ	রমা
(২৯)	দ্বিজিহ্ব	মহিষী
(৩০)	শূর	ভঞ্জিনী
(৩১)	বীর	বি[illegible]পা
(৩২)	ষণ্মুখ	ভ্রুকুটি
(৩৩)	বরদ	লজ্জা
(৩৪)	বামদেব	দীর্ঘঘোনা
(৩৫)	বক্রতুণ্ড	ধনুর্ধরা
(৩৬)	দ্বিরস্তক	যামিনী
(৩৭)	সেনানীরমন	রাত্রি
(৩৮)	মত্ত	কামান্ধা
(৩৯)	বিমত্ত	শশিপ্রভা
(৪০)	মত্তবাহন	লোলাক্ষী
(৪১)	জটী	চঞ্চলা
(৪২)	মুণ্ডী	দীপ্তি

(৪৩)	খড়্গা	দুর্ভগা	(৪৭)	গণেশ	ভগিনী
(৪৪)	বরেণ্য	সুভাগা	(৪৮)	মেঘনাদক	ভোগিনী
(৪৫)	বৃষকেতন	শিবা	(৪৯)	ব্যাপী	কালরাত্রি
(৪৬)	ভক্ষপ্রিয়	ভর্গা	(৫০)	গণেশ্বর	কালিকা

বিভিন্ন স্থানে গণেশের নিম্নলিখিত নামসমূহ বিশেষতঃ দেখা যায়—

(১) বক্রতুণ্ড, (২) একদন্ত, (৩) বিনায়ক, (৪) গণপতি, (৫) বিঘ্নেশ্বর, (৬) অখু-রথ, (৭) সিদ্ধিদাতা, (৮) হেরম্ব, (৯) দ্বি-দেহক (১০) লম্বোদর, (১১) গজানন ও (১২) বালগণপতি; তামিল নাম—পিল্লেয়র।

পুরাণাদিতে কিন্তু এতগুলি গণেশের নাম পাওয়া যায় না, এতগুলি শক্তিরও নাম নাই। গণেশের নামে একখানি উপনিষদ্‌ও তৈয়ারী হইয়াছে। উপনিষদ্‌খানির নাম—'গণেশাথর্বশীর্ষোপনিষৎ'। এখানিও কোনও প্রাচীন রচনা নয়। এগুলিতেও গণেশের এত প্রকারভেদ পাওয়া যায় না। অগ্নিপুরাণ গণেশের গায়ত্রী দিয়াছেন। (৭১. ৬), পূজা পদ্ধতি দিয়াছেন (৭১. ১-৩) পবিত্রারোহন মন্ত্র দিয়াছেন (৩৮. ৮), গণেশের শক্তিরও নাম করিয়াছেন (৭১. ৪-৫)। অগ্নিপুরাণের গণেশের-শক্তির নাম—জ্বালিনী, সুর্যেশা, কামরূপা, উদয়া, কামবর্তিনী, সত্যা, বিঘ্ননাশা ও গন্ধমৃত্তিকা। এই শক্তিগুলির মধ্যে শারদাতিলকের নির্দিষ্ট জ্বালিনী, কামরূপা, সত্যা ও বিঘ্ননাশা এই কয়টীকেই পাই।

বিভিন্ন দেশে গণেশের নাম—

তিব্বত—ৎসা'গ্‌স্‌-ব্‌দগ্‌ ও ব্‌গেগ্‌স মেদ্‌প'ই ব্‌দগ্‌ পো;

বর্মা—মহা-পিত্রন্নে;

মোঙ্গল—তোৎখর্‌-ওউন খঘন্‌;

কম্বোজ—প্রাহ্‌ কেনেস্‌;

চীন—কুঅন্‌-শি তি' এন্‌;

জাপান—শো-তেন্, বিনায়ক্‌শ, কৃব্‌ন্‌জন্-শো ও কঙ্গি-তেন্।

এই বিদেশী নামগুলি গেটী তাহার গ্রন্থে দিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থ হইতে গণেশ সম্বন্ধে আরও কয়েকটী বিষয় এই প্রবন্ধে গৃহীত হইয়াছে।

গণেশের পত্নী—বুদ্ধি ও সিদ্ধি; শক্তি—লক্ষ্মী (ইনি নারায়ণ-পত্নী লক্ষ্মী নহেন)। তাঁহার মুদ্রা—বিতর্ক ও তর্জ্জনী। বর্ণ—লোহিত, পীত, পীতলোহিত, শ্বেত। প্রতীক—ভগ্ন, হস্তীদন্ত, মোদক, বতসের সম্পুটক, জলপাত্র, আকাশবল্লী, বিগোর ফল, খড়্গ, অক্ষমালা, হস্তীতাড়নের অঙ্কুশ, ডালিম ফল, লোহিতাভা, জম্বু ফল প্রভৃতি। বীজ—গঙ্। বাহন মূষিক। অনেক সময় বাহন মূষিকের স্থলে সিংহও দেখা যায়।

'সিদ্ধিদাতা গণেশ' এই কথায় হিন্দু মাত্রেরই প্রগাঢ় আস্থা। সকল বিপদ-আপদে গণেশের নাম লইলে বিপত্তি নাশ হইয়া যায়। কোন ধর্মকর্ম করিবার সময়, পুস্তক লিখিবার সময়, গৃহনির্মাণ-কালে, সকল কাজের সূচনায় গণেশের নাম লইতে হয়। হিন্দু যাত্রা করিবে গণেশকে নমস্কার করিয়া। কারবারী তার কর্মস্থলে সিন্দূর দিয়া লিখিবে—'সিদ্ধিদাতা গণেশ'—'গণেশায় নমঃ'। ওঁকার ও অথকারের ন্যায় আরব্ধ কার্যে কোন বিপত্তি না হয় তজ্জন্য বিঘ্নবিনাশন গণপতির আরাধনা একান্ত আবশ্যক বুঝিয়া সকল হিন্দুই গণেশের তুষ্টি সম্পাদন করিয়া থাকেন। গণেশের নামে সকল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য; কাজেই সিন্দুর-লিপ্ত গণেশের মূর্তি ভারতের সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। দাহকার্য ব্যতীত সকল অনুষ্ঠানেই গণেশকে ডাকা হইয়া থাকে। পঞ্চদেবতার পূজায় প্রথমেই গণেশের পূজা করিতে হয়। শ্রীবৈষ্ণব ছাড়া সকল সম্প্রদায়ই গণেশকে মানিয়া চলে। আমাদের দেশে অন্যান্য পূজার ন্যায় গণেশ-পূজা প্রসার লাভ না করিলেও সমস্ত দেবতার পূজার পূর্বে গণেশের পূজার প্রয়োজন। পুরাণকারও

একথা বলিতে ছাড়েন নাই। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর আমাদের প্রধান দেবতা। শিবপুরাণ (জ্ঞানসংহিতা ৩৪ অধ্যায়) এই তিন দেবের মুখ দিয়া গণেশপূজা উপলক্ষ করিয়া বলাইয়াছেন—"এতৎ-পূজাং পরঃকৃত্বা পশ্চাৎ পূজ্যা বয়ং নরৈঃ।" সর্বাগ্রে গণেশ বন্দনা চাই। গণেশের বর্ণ লোহিত, আর সিন্দুরও লোহিত বর্ণের কাজেই সিন্দুর দিয়াই তাঁহার পূজা করিতে হয়।

'তস্মাৎ ত্বং পূজনীয়োসি সিন্দূরেণ সদা নরৈঃ

গণেশের অনেক নাম সারদাতিলকে একান্ন রকম গণেশের আলোচনা আছে। মুগ্দলপুরাণে বত্রিশ রকম গণপতির রূপ বিবৃত আছে। এই সমস্ত গণপতির গুণও অনেক প্রকারের। দিগ্‌দর্শন হিসাবে উদাহরণস্বরূপ দুইটী গণেশমূর্তির বিবরণ সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল।

কেবল-গণেশ

কেবল-গণেশের হস্তে পাশাঙ্কুশাদি দেখিতে পাওয়া যায়। আর একরূপ গণেশ মূর্তি আছে। উহার হস্তেও পাশাঙ্কুশাদি থাকে। তিনি হইলেন 'নৃত্ত-গণেশ। কেবল-গণেশের প্রাচীন মূর্তি নাই। গজদন্ত-নির্মিত একটী গণেশমূর্তি আছে। গোপীনাথ রাওএর গ্রন্থে এই গণেশের চিত্র আছে। ইহার ধ্যান কিন্তু পাওয়া যায় না।

উচ্ছিষ্ট-গণেশ

উচ্ছিষ্ট-গণেশের মূর্তি পদ্মাসনে সমাসীন। ক্রিয়াক্রমদ্যোতির বচনানুসারে এই মূর্তির হস্তে পদ্ম, দাড়িম্ব, বীণা, ধান্য ও অক্ষমালা থাকিবে, মন্ত্র-মহার্ণবমতে এই গণেশের হস্তে বাণ, ধনু পাশ ও অঙ্কুশ থাকিবে। মূর্তিটীর বর্ণ ঈষৎ রক্তাভ। উচ্ছিষ্ট-গণেশ সর্বসিদ্ধিপ্রদ; সুতরাং বহুবিধ অভীষ্টসিদ্ধির জন্য অনেকে এই গণেশের পূজা করিয়া থাকে। এই গণেশের অঙ্কে দেবীমূর্তি। দেবীমূর্তির নাম বিঘ্নেশ্বরী। বিঘ্নেশ্বরী সর্বাভরণভূষিতা, নগ্না,

দ্বিভুজা। উত্তরকামিকাগমে উচ্ছিষ্ট-গণেশমূর্তির যথাযথ বর্ণনা আছে। ইহার মতে মূর্তিটী সমাসীন অবস্থায় থাকিবে, ইহা চতুর্ভুজ। তিন হস্তে পাশ, অঙ্কুশ, ও ইক্ষুদণ্ড, অপর হস্তে নগ্না দেবীকে ধারণ করিয়া আছে। মূর্তি—কৃষ্ণ ও ত্রিনেত্রবিশিষ্ট। এই মূর্তি মস্তকে মুকুট ধারণ করিবে। গ্রন্থে উচ্ছিষ্ট-গণেশের যেরূপ বর্ণনা আছে তাহার সহিত ক্ষোদিত মূর্তির বিশেষ পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। উচ্ছিষ্ট-গণেশের যতগুলি মূর্তি আছে তাহাদের প্রত্যেক গণেশেরই অঙ্কে নগ্না দেবীমূর্তি—গণেশের দুই হস্তে পাশ ও অঙ্কুশ—এক হস্তে লড্ডুক এবং আর এক হস্তে তিনি দেবীর কটিদেশ ধারণ করিয়া আছেন। দেবীর হস্তে পদ্ম। ধ্যান যথা—

লীলাব্জং দাড়িমং বীণাশালী পুচ্ছাক্ষসূত্রকম্।
দধদুচ্ছিষ্টনামানং গণেশং বীরমেব চ॥

(ক্রিয়াক্রমদ্যোতি)

শরং ধনুঃ পাশসৃণী সহস্তৈর্দধানমারক্তসরোরুহস্থং।
বিবস্ত্রপত্ন্যা সুরতপ্রবৃত্তমুচ্ছিষ্টমম্বসুতমাশ্রয়েঽহং॥
চতুর্ভুজং রক্ততনুং ত্রিনেত্রং পাশাঙ্কুশৌ মোদকপাত্রদন্তৌ।
করৈর্দধানাং সরসীরুহস্থমুন্মত্তমুচ্ছিষ্টগণেশমীড়ে॥

(মন্ত্র-মহার্ণব)

পুরাণকারেরা গণেশের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা রকমের বিবরণ দিয়াছেন। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, বরাহপুরাণ, শিবপুরাণ, লিঙ্গপুরাণ, ও দক্ষিণ ভারতের সুপ্রভেদাগম গণেশের বহু কীর্তিকাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছে। তন্ত্রেও গণেশের অনেক কথা আছে। এ সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে আমরা বারান্তরে আলোচনা করিব। ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে যে, বিনায়ক সূর্যমন্দিরে পূজিত হইতেন। নেপাল রাজ্যে হিন্দু ও বৌদ্ধ সকল সম্প্রদায়ই অদ্যাপি সকল কার্যে সিদ্ধিলাভের জন্য কার্যের প্রারম্ভে বিনায়কের আরাধনা করিয়া থাকে। নেপালীরা বৌদ্ধধর্ম এক রকম মানিয়া

লইয়াছে। তাহারা নাগ পূজা করে, বৌদ্ধদেবতা ও মঞ্জুশ্রী বোধিসত্ত্বের পূজা করে। হিন্দু দেবতা গণেশ ও কৃষ্ণের খাতিরও খুব বেশী। বিনয়কিয় নাম অবলম্বন করিয়া জাপানীরা গণেশের নাম দিয়াছে 'বিনয়কিয়।' শ্যামদেশের মন্দিরে গণেশমূর্তি আছে। চম্পায় স্কন্দ ও গণেশমূর্তি বিরল। নাত্রঙ্ (Nhatrang) নামক স্থানে গণেশের (শ্রীবিনায়কের) একটী মন্দির ছিল। এখন নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বোরোবোদর হইতে অতি অল্প দূরে বনোন নামক স্থান। এখানে শৈব মন্দির আছে। কলসনের নিকটে প্রম্বনম্ নামক স্থানে শ্রেণীবদ্ধভাবে আটটী মন্দির আছে। সেগুলির মধ্যে চারিটী ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও নন্দির। শিবের মন্দিরটীই সকলের চেয়ে বড় এবং সকলের চেয়ে ভাল কাজ করা। এই মন্দিরের সংলগ্ন হইয়া চারিটী মন্দির আছে। চারিটী মন্দিরে চারিটী মূর্তি—মহাদেবের মূর্তি, গুরুমূর্তি, গণেশমূর্তি ও দুর্গামূর্তি।

সিঙ্গসরি মন্দিরে একদিকে প্রজ্ঞাপারমিতা, মঞ্জুশ্রী, তারা, অপরদিকে গণেশ, গুরু, নন্দীশ্বর, মহাকাল প্রভৃতি মূর্তিতে শিব, দুর্গা ও ব্রহ্মা।

বলিদ্বীপবাসীরা বলে তাহাদের সঙ্গে মজপহিত (Madjapahit) ও হিন্দুধর্মের যথেষ্ট সম্বন্ধ আছে। তাহাদের শিল্পেও হিন্দু দেবতার নাম আছে। গণেশ, ইন্দ্র, বিষ্ণু, কৃষ্ণ, সূর্য, গরুর, শিব—এই সমস্ত দেবতার নাম তাহাদের নিকট বিশেষ পরিচিত। কিন্তু তাহারা শিব (লিঙ্গ) ও দুর্গা ব্যতীত কোন দেবতার পূজা করে না। ভারতবর্ষে যত গণেশ-মন্দির আছে তাহাদের মধ্যে পুনা ও মহাবলেশ্বরের মধ্যবর্তী ওয়া-ই (Wa-i) নামক স্থানে গণেশ মন্দির সকলের চেয়ে বড়। এই মন্দিরে গণেশের একটী প্রকাণ্ড মূর্তি আছে। যে সে আসিয়া এই গণেশের পায়ে জল ছোঁয়াইয়া যায়। কোন বাধা নাই। ত্রিচিনপল্লীর পাহাড়ের উপর আর একটী বড় গণেশ মন্দির আছে।

শুধু গণেশের পূজা করে, এমন সম্প্রদায় বড় একটা দেখা যায় না। পূর্বে গাণপত্যেরা ছয়টী সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। শঙ্করবিজয়ে পাওয়া যায় তাহারা ছয় রকমের গণেশ পূজা করিত। ছয় সম্প্রদায় মহাগণপতি, হরিদ্রাগণপতি, উচ্ছিষ্ট বা হেরম্বগণপতি, স্বর্ণগণপতি, সন্তানগণপতি এই ছয় গণপতির পূজা করিত। বারাণসীধামে এক গণেশ আছেন, তাঁহাকে লোকে ঢুণ্ঢিরাজ বলে। যে কেহ বারাণসীর পঞ্চক্রোশীতে মন্দির দর্শন করিতে যান, তাঁহাকে সাক্ষী-বিনায়ক দেখিয়া আসিতে হয়। সাক্ষী-বিনায়ক ঢুণ্ঢিরাজের রূপ।

কাহারও কাহারও ধারণা গণেশপূজা অতি আধুনিক। তাঁহারা বলিয়া থাকেন, রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে শিবের একটী স্তোত্র আছে। এই স্তোত্রে শিবকেই গণেশ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এ গণেশ শিব ছাড়া আর কেহ নন। কেননা শিবের অনুচরদের "গণ" বলা হয়। রামায়ণে পৃথক্‌ভাবে কোন দেবতার উল্লেখ নাই পঞ্চতন্ত্র খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর গ্রন্থ। ইহাতে সিদ্ধিদাতা দেবতাদের প্রণাম আছে; কিন্তু সেই দেবতাদের মধ্যে গণেশের নাম নাই। বৎস, ভট্টি, কালিদাস, ভারবি—ইঁহাদের গ্রন্থেও গণেশের নাম নাই। ইঁহাদের সময়ের কোন শিলালিপিতেও গণেশের নাম নাই। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে রঙ্গ ভূমির শুভ কামনায় অনেক দেবতার পূজার ব্যবস্থা আছে। দেবতার ফিরিস্তিও খুব লম্বা কিন্তু, তাহাতেও গণেশের নাম নাই।

উত্তরপ্রদেশের কবি বাণভট্টের কাদম্বরীতে পাওয়া যায়—"অবকীর্ণভষ্মসূচিত-মগ্নোত্থিত-গণবৃন্দোদ্ধূলনম্ অবগাহাবতীর্ণ-গণপতি গণ্ডস্থলগলিত-মদপ্রস্রবণ-সিক্তম্।"

এখানে "গণ"দের অধিপতি ও সহচর গণপতির উল্লেখ করা হইয়াছে। গন্ধর্ব, কিন্নরদের কথাপ্রসঙ্গে গণপতির নামকরণ হইয়াছে। এই সমস্ত অজুহাতে শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

মহাশয় (বঙ্গদর্শন, ১৩১০, পৃঃ ৫৮৯) গণেশকে আধুনিক দেবতা বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহেন। কিন্তু গণেশ যে আধুনিক দেবতা নন, অতি প্রাচীন সাহিত্যে ও মুর্তিতত্ত্বে তাহার প্রমাণ আছে। আমরা ক্রমশঃ তাহা দেখিতে চেষ্টা করিব। "গণ" দিগের অধিপতি বলিয়া গণপতি গণেশ এই নাম। "গণ" বলিলে আমরা কি বুঝি ?—গণ বলিলে বুঝায় রুদ্রের গণ, প্রমথ। মরুৎ যাহারা তাহারাও রুদ্রগণ। ইহাদের আকৃতির বর্ণনা কিছু উদ্ভট রকমের। ইহাদের অনেকেরই মুণ্ড কোন-না কোন জন্তুর। গণপতি শব্দ খুব প্রাচীন। ঋগ্বেদে দুইবার গণপতি শব্দের প্রয়োগ আছে। তন্মধ্যে দ্বিতীয় মণ্ডলে (২৩. ১)—

গণনাং ত্বা গণপতিং হবামহে
কবিং কবীনামুপমশ্রবস্তমম্।
জ্যেষ্ঠরাজং ব্রহ্মণাং ব্রহ্মণস্পত
আ নঃশৃণ্বন্নতিভিঃ সীদ সাদানম্॥

বেদে আমরা গণদিগকে যেমন পাই, গণপতিকেও সেইরূপ পাই। ঋগ্বেদে কিন্তু গণদিগের অধীশ্বর ব্রহ্ম (ব্রাহ্মণ), ব্রহ্মণস্পতি বৃহস্পতি (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ১ পঞ্চিকা, ৪ খণ্ড ৩ অঃ, ১ পটল)। ইহার পর আমরা তৈত্তিরীয় আরণ্যকে গণপতিকে পাই। এ গণপতি কিন্তু আমাদের গণেশ না হইয়া যায় না। তিনি সেখানে "বক্রতুণ্ড ও দন্তি" ; সুতরাং আমাদের গণেশ। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের মন্ত্র এইরূপ—

পুরুষস্য বিদ্ম সহস্রাক্ষস্য মহাদেবস্য ধীমহি।
তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ ॥
তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি।
তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ ॥
তৎপুরুষায় বিদ্মহে বক্রতুণ্ডায় ধীমহি।
তন্নো দন্তিঃ প্রচোদয়াৎ ॥

তৎপুরুষায় বিদ্মহে বক্রতুণ্ডায় ধীমহি।
তন্নো নন্দিঃ প্রচোদয়াৎ॥
তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাসেনায় ধীমহি।
তন্নঃ ষন্মুখঃ প্রচোদয়াৎ॥
কাত্যায়নায় বিদ্মহে কন্যকুমারী ধীমহি।
তন্নো দুর্গিঃ প্রচোদয়াৎ॥

এই মন্ত্রগুলিতে মহাদেব, গণেশ, নন্দি ও দুর্গার স্তুতি আছে। এই গ্রন্থকে যতই এদিকে টানিয়া আনা হউক না কেন, আড়াই হাজার বছরের পরে কিছুতেই ফেলিতে পারা যায় না।

গণেশ বোধ হয় প্রথম প্রথম বিঘ্নেরই দেবতা ছিলেন। বৌদ্ধ শাস্ত্রে এই বিঘ্নদেবের বেশ একটু পরিচয় আছে।

গায়কোয়াড় হইতে সাধনমালা প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ সাধনমালায় দেখিতে পাওয়া যায়, 'গণেশ', 'বিঘ্ন' নামে আখ্যাত হইয়াছেন। বিঘ্নের মূর্তি ও আমাদের গণেশের মূর্তিতে কিছুই পার্থক্য নাই। এই বিঘ্ন স্বীয় গণসহ বিচরণ করে একথাও সাধন মালা হইতে বুঝিতে পারা যায়। তান্ত্রিক বৌদ্ধেরা এক বিঘ্নান্তক দেবের কল্পনা করিয়াছেন। তাঁহারা বিঘ্ননাশনকারী কল্যাণদাতা বিঘ্নান্তক দেবের দ্বারা বিঘ্ন বা গণেশের দুর্দ্দশার চূড়ান্ত করিয়াছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে বিঘ্নান্তকের একটী মূর্তি রক্ষিত আছে। ডক্টর শ্রীযুক্ত বিনয়তোষ ভট্টাচার্যকৃত বৌদ্ধমূর্তিতত্ত্বেও গণেশের অবমাননার এই চিত্রটী প্রদত্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থে 'গণেশহৃদয়া' নামে গণেশের অঙ্কলক্ষ্মীরও একটী চিত্র আছে। ধর্মকোষসংগ্রহে বিঘ্নান্তকের গণেশ-শাসনের একটী আখ্যায়িকা আছে। নেপালেও এ সম্বন্ধে একটী গল্প আছে। এক সময়ে একজন ওড়িয়ান বজ্রাচার্য সিদ্ধিলাভের জন্য কাঠমাণ্ডুর নিকটে বাঘমতী নদীতটে তান্ত্রিক প্রক্রিয়া করিতেছিলেন। গণেশের স্বভাব বিঘ্ন উৎপাদন করা। এক্ষেত্রেও তিনি তাই করিলেন। ওড়িয়ান পণ্ডিত নিরূপায় দেখিয়া বিঘ্নান্তকের স্তুতি

করিতে লাগিলেন। বিঘ্নান্তক তন্মুহূর্তে আবির্ভূত হইয়া গণেশকে পদদলিত করিলেন। গণেশ কোন রকমে পলাইয়া বাঁচিলেন। ধর্মকোষসংগ্রহের কাহিনী একটু অন্যরূপ।

কলিকাতায় প্রত্নশালায় পর্ণশবরীর একটী ভগ্নমূর্তি আছে। ইঁহার তিনমুখ, ছয় হাত। ইনিই গণেশকে নির্যাতিত করিয়াছেন। পর্ণশবরীর ধ্যান এইরূপ—

"ভগবতীং পীতবর্ণাং ত্রিমুখাং ত্রিনেত্রাং ষড়্ভুজাং প্রথমমুখং পীতং, দক্ষিণাং সিতং, বামং রক্তং, ললিতহাসিনীং সর্বালঙ্কারধরাং পর্ণপিচ্ছিকাবসানং নবযৌবনোদ্ধতাং পীনাং, দক্ষিণভুজৈঃ বজ্রপরশু-শরধারিণীং, বামভুজৈঃ শতর্জনীকাপাশপর্ণপিচ্ছিকা ধনুর্ধারিণীং পুষ্পাববদ্ধজটামুকুটস্থ অক্ষোভ্যধারিণীং সূর্যপ্রভামণ্ডলিণীং, অধো বিঘ্নান্ নিপাত্য সিতপদ্মচন্দ্রাসনে প্রত্যালীঢ়স্থাং হৃদ্বামমুষ্টিতর্জন্যাধো বিঘ্নগণান্ সন্তর্জ্য দক্ষিণবজ্রমুষ্টি প্রহারাভিনয়াং…………ভাবয়েৎ।"

সাধনমালা।

সাধনমালায় গণপতিরও ধ্যান আছে। এই বৌদ্ধগ্রন্থে বর্ণিত গণপতি রক্তবর্ণ, ইঁহার ১২ হাত, বাহন মুষিক। গণপতি অর্ধপর্যঙ্কাসনে, নৃত্যশীল।

গণপতির ধ্যান যথা—

'ভগবন্তং গণপতিং রক্তবর্ণং জটামুকুটকিরীটিনিং সর্বাভরণভূষিতং দ্বাদশভুজং লম্বোদরৈকবদনং অর্ধপঙ্কতাণ্ডবং ত্রিনেত্রং অপি একদন্তং সব্যভুজেষু কুঠার-শর-অঙ্কুশ-বজ্র-খড়্গ-শূলঞ্চ; বামভুজেষু মুষল-চাপ-খট্টাঙ্গ-অসৃক্‌কপাল-শুষ্কমাংসকপাল-ফট্‌কঞ্চ রক্তপদ্মে মুষিকোপরিস্থিং ধ্যায়েৎ।' সাধনমালা।

বৌদ্ধগ্রন্থে গণেশকে বিঘ্নরাজরূপে চিত্রিত করা হইয়াছে। বিঘ্ন করাই তাঁহার কাজ। আমাদের শাস্ত্রেও (মানব-গৃহ্যসূত্র ২. ২৪ ইত্যাদি) গণপতি এক সময়ে বিঘ্নের দেবতাই ছিলেন। কোথাও বা ইঁহার নাম বিনায়ক। তখনও তাঁহার বাহন মুষিক।

যখনই কোন লোক কোন শুভকার্য করিবার সূচনা করিত তখনই গণেশ নানাপ্রকারে বিঘ্ন সম্পাদন করিতেন। কেহ লিখিবে, লিখিবার উপকরণ ঠিক করিয়াছে, মূষিক অমনি উপকরণের সদ্গতি করিয়া আসিল। কেহ সবে লিখিয়া রাখিয়াছে অমনই মূষিক গণেশের ইঙ্গিতে তাহা কাটিয়া টুকরা টুকরা করিয়া দিল। এইরূপে যে যখন যে অনুষ্ঠান করিবে গণেশ তাহাতে বিঘ্ন উৎপাদন করিয়া দিতেন। শেষে লোকেরা বিঘ্নেশের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য স্থির করিল। গণেশের স্তুতি করিয়া তুষ্টি সম্পাদন করিল। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায়ও (উত্তর পর্ব, ৩৩ অঃ) গণেশের রোষদৃষ্টি হইলে লোকেদের কিরূপ দুর্দশা হইত তাহার একটী বর্ণনা আছে। বর্ণনাটী এই—

তেনোপসৃষ্টো যস্তস্য লক্ষণানি নিবোধত।
স্বপ্নেবগাহতেঽত্যর্থং জলং মুণ্ডাংশ্চ পশ্যতি॥
কাষায়বাসসশ্চৈব,ক্রব্যাদাংশ্চাবিয়োহতি।
অন্ত্যজৈর্গর্দভৈরুষ্ট্রৈ-সহৈকত্রাবতিষ্ঠতে॥
ব্রজন্তঞ্চ তথাত্মানং মন্যতেঽনুগতং পরৈঃ।
বিমনা বিফলারম্ভঃ, সংসীদত্যনিমিত্ততঃ॥
তেনোপসৃষ্টো লভতে ন রাজ্যং রাজনন্দনঃ।
কুমারী ন চ ভর্তারম্, অপত্যং ন চ গর্ভিণী॥
আচার্যত্বং শ্রোত্রিয়ঞ্চ, ন শিষ্যোঽধ্যয়মং তথা।
বিণিগ্ লাভং ন চাপ্নোতি ,কৃষিঞ্চৈব কৃষিবমঃ॥

মূর্তিতত্ত্বে গণেশ

গুপ্তযুগের পূর্বে গণেশের মূর্তি কোথাও পাওয়া যায় না। হঠাৎ এই যুগেই গণেশমূর্তির আবির্ভাব। দেওগড় ও ভুমরের গণেশমূর্তি (Mem. A. S. I. No 16. pl. xv.) এই সিদ্ধান্তের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। হঠাৎ গণেশমূর্তি গুপ্ত যুগে কোথা হইতে আসিল? গণেশের মূর্তির উপযোগী কল্পনা বহু পূর্ব হইতেই লোকের

মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া ক্রমশঃ গণেশ মূর্তি গড়িয়া তুলিয়াছে। হাতীর মাথাওয়ালামূর্তির কথা যাজ্ঞিকী উপনিষদে পাওয়া যায়। যাজ্ঞিকী উপনিষৎ উপনিষদের পরিশিষ্ট হইলেও আড়াই হাজার বছরের পরে আসিবে না। যক্ষগণের মধ্যের জন্তুর মুণ্ডের অসম্ভাব নাই। ইহারও কম প্রাচীন নয়। অমরাবতীতেও কতকগুলি মূর্তি আছে, ইহাদের হস্তে পুষ্পমাল্য। এই মূর্তিগুলির হস্তি মুণ্ড ইহারা খর্বাকৃতি। এরূপ পুষ্পমাল্যবাহিনী মূর্তি সাধারণতঃ যক্ষদেরই হইয়া থাকে। এই সমস্ত হইতে কোন রকমে গণেশমূর্তির কল্পনা হইয়া থাকিবে। বৈদিক যুগের কোন তত্ত্ব হইতে গণেশের আকৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না।

গণেশ-মন্দির

ভারতের সকল জায়গায়ই গণেশের মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। অঞ্জনেরীর নিম্নদেশে কতকগুলি ভগ্ন মন্দির আছে। এই মন্দির গুলি দেবগিরির যাদবদের সময়ে (১১৫০—১৩০৮) নির্মিত। এখানে অনেকগুলি নানা আকারের ভগ্ন গণেশ মূর্তি পড়িয়া আছে।

রাজপুতনার অন্তর্গত উদয়পুরে ভৈঁসরোরগড় নামে একটী গ্রাম আছে। এই গ্রামে কয়েকটী গণেশমূর্তি আছে। মন্দিরগুলি নবম বা দশম শতকে নির্মিত।

মাদ্রাজে চিদম্বরমে একটী বিরাট্ শিবমন্দির আছে। এই মন্দিরে পাঁচটী মণ্ডপ আছে। ইহাদের মধ্যে একটী মণ্ডপে গণেশ-মন্দির আছে।

বঙ্গদেশে মহারাজ রামসাহীদেব ও তাঁহার ভ্রাতা অষ্টাদশ শতকের শেষ পাদে পাঁচ ছয়টী গণেশ ও মহাদেব-মন্দির নির্মাণ করিয়াছেন।

গোয়ালিয়র-দুর্গে নাম করিবার মত মন্দিরের মধ্যে তেলিমন্দির উল্লেখ্য মন্দিরের মধ্যে তৃতীয়। দুর্গে এইটীই সর্বোচ্চ স্থান। প্রথমে এটী বৈষ্ণব-মন্দির ছিল। আগেকার তৈরী দরজার উপর গরুড় প্রভৃতি তাহার নিদর্শন। পঞ্চদশ শতকে যখন এটীকে শৈবেরা

নিজেদের কাজে লাগান, তখন এই দরজার ভিতর আর একটী অপেক্ষাকৃত ছোট দরজা তৈরী করা হয়। এই দরজার মাথায় শিব-নন্দন গণেশের মূর্তি আছে। দশম বা একাদশ শতকে এই মন্দিরটী নির্মিত হইতে আরম্ভ হয়।

ওড়িষ্যায় কটকের যাজপুর সবডিভিশনে বরিউনিকুম্ভ পাহাড়ের পবিত্র শৃঙ্গদেশে মহাবিনায়কের পূজা হয়। সন্ন্যাসীরা অনেককাল ধরিয়া ইহাকে শিবপূজার পবিত্র স্থান বলিয়া মনে করিত। পরে বৈষ্ণবেরা পাহাড়ের উত্তরে ঢালু জায়গায় একটী আশ্রম নির্মাণ করে। এখানে ১২ ফুট পরিধিযুক্ত একটী প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ড আছে। দেখিতে অনেকটা গণেশের মত। দক্ষিণদিকে একটা মুখের আকৃতি। লোকে ইহাকে গণেশের পিতা শিবের মুখ বলে। বামদিকের মুখটার মাথা ঝাঁটার মত। এটী লোকে গণেশের মাতা গৌরীর খোঁপা বলিয়া থাকে। সুতরাং পাহাড়ের এই অংশটীকে লোকে শিবগৌরী ও গণেশের সংযুক্ত মূর্তি বলিয়া পূজা করে।

মধ্যপ্রদেশের সুরগুজা স্টেটে রামগড় পাহাড়ে ২,৬০০ ফুট উচ্চে একটী অতি প্রাচীন পাথরের দরজা আছে। দরজার মাথায় গণেশের খোদিত মূর্তি আছে।

ত্রিচিনোপলির বিখ্যাত পর্বতে কতকগুলি ছোট ছোট মন্দির আছে। এগুলিতে গণেশের মূর্তি আছে।

বোম্বাই প্রদেশে গণেশকে লোকে গণপতি বলে। এই প্রদেশে চন্দোরদুর্গ পাহাড়ের জৈনগুহা খনন করিয়া বাহির করা হইয়াছে। এই গুহায় গণপতি ও দেবীর মূর্তি আছে। ইহাতে তীর্থঙ্করদেরও মূর্তি আছে।

হুলি নামক স্থানে একটী সুন্দর পঞ্চলিঙ্গদেবের ভগ্ন মন্দির আছে। পূর্বে এটী জৈনবস্তি ছিল। এই মন্দির মধ্যে একটী লিঙ্গায়তদের লিপি, একটী অদ্ভুত রকমের নাগমূর্তি, আর একটী গণেশ-মূর্তি আছে। সম্ভবতঃ অন্য মন্দির হইতে সংগৃহীত।

বোম্বাইয়ে বোগবদি উপত্যকায় বাসেশ্বরের একটী মন্দির আছে। তন্মধ্যে গণপতি, সঙ্গমেশ্বর, মল্লিকার্জুন ও বাসেশ্বরের মূর্তি আছে।

বোম্বাইয়ে পুণা জেলায় চিন্‌চোয়াড় নামে একটী গ্রাম আছে। এই গ্রামখানি গণপতি মন্দিরের জন্য বিখ্যাত। এই গণপতি সম্বন্ধে কৌতুকাবহ একটী আখ্যান আছে। সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি মোরোব নামে একটি ছোট ছেলের দেহ অবলম্বন করিয়া গণপতি আবির্ভূত হন। এই বালকের অত্যাশ্চর্য কার্যাবলী অনেকে প্রত্যক্ষ করে। ইহার মৃত্যুর পর ইহার বংশে গণপতি অনেকবার অবতীর্ণ হন। মোরোবের পুত্র চিন্তামন দ্বিতীয় জীবন্ত দেবতা হইয়াছিলেন। তুকারাম গর্ব করিতেন যে, বিঠোবা তাঁহার সহিত ভোজন করিত। তাঁহার গর্ব নষ্ট করিবার জন্য ইনি গণপতির আকার ধারণ করেন। তুকারাম তাঁহাকে “দেব” বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ইহা হইতে এই বংশ দেব-বংশ বলিয়া পরিচিত হইয়া আসিতেছে। চিন্তামনের মৃত্যুর পর নারায়ণ তাঁহার উত্তরাধিকারী হন। প্রবাদ আছে ঔরঙ্গজেব তাঁহার শক্তি পরীক্ষা করিবার জন্য একটি পাত্রে গোমাংস রাখিয়া তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দেন। নারায়ণ অদ্ভুত শক্তিবলে সেগুলিকে যুঁইফুলে পরিণত করেন। বাদশাহ্ তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া এই দেব বংশকে আটখানি গ্রাম বংশানুক্রমে ভোগদখল করিবার অধিকার দেন। এই দেব-বংশের শেষ পুরুষ একটি অন্যায় কার্য করিয়া অভিশপ্ত হন। তিনি মোরোবের সমাধি খুঁড়িয়া বাহির করেন। মোরোবের ধ্যান ভঙ্গ হওয়ায় তিনি বলেন যে তাঁহার পুত্রের পর আর কেহ ঈশ্বরত্ব লাভ করিতে পারিবে না। বস্তুতঃ এই পুত্র ১৮১০ সালে অপুত্রক অবস্থায় দেহত্যাগ করেন। এই দেববংশ মনোরম অট্টালিকায় বাস করেন। প্রাসাদের নিকটে দেবের দুইটি মন্দির। প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণা ষষ্ঠী তিথিতে এখানে গণপতির মেলা হয়। প্রায় ২,০০০ লোক জড় হয়। মেলা সাত দিন থাকে।

বোম্বাই এরণ্ডলে একটী গণপতি-মন্দির আছে।

এ প্রদেশে সপ্তশৃঙ্গ ও তওগাঁও নামক স্থানে গণপতির মন্দির আছে। তওগাঁওর মন্দির একশত বর্ষের পুরাতন। পুণা City Municipality ও একটি গণপতির মন্দির তৈয়ারী করিয়া দিয়াছে।

মগধে বৌদ্ধদিগের ভগ্নাবশেষ আছে, ব্রাহ্মণ্য ভগ্নাবশেষও আছে। এখানে মহিষমর্দিনী দুর্গা, শিব, পার্বতী এবং গণেশের মূর্তিও পাওয়া যায়।

গয়া জেলায় বরাবর পাহাড়ে শিব, দুর্গা ও গণেশের ক্ষোদিত মূর্তি আছে। মন্দির প্রায় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কতকগুলি পাথর মাত্র পড়িয়া আছে। মন্দিরের মধ্যে বাগেশ্বরী, ভৈরব, কার্ত্তিক ও গণেশের মুর্তি আছে। একটি গর্ভগৃহে একটি বড় লিঙ্গ। প্রাচীরের নিকট একটি গর্তে ৬ষ্ঠ বা ৭ম শতকের লিপি আছে।

কাশ্মীরে অবন্তীপুর গ্রামের নিকট অবন্তীশ্বর মন্দিরে অর্ধনারীশ্বর ও গণপতির অতি প্রাচীন অসম্পূর্ণ মূর্তি পাওয়া গিয়াছে।

সাধারণতঃ গণেশের যে সকল মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায় তন্মধ্যে উচ্ছিষ্ট ও কেবল গণেশের ধ্যানসহ বিবরণ পূর্বে প্রদান করা হইয়াছে। এক্ষণে আরও কয়েকটী মূর্তির পরিচয় ধ্যানসহ দেওয়া যাইতেছে। এগুলি সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ শাস্ত্রী ও স্বর্গীয় গোপীনাথ রাও পণ্ডিত-দ্বয়ের গ্রন্থ হইতেও সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি।

মহাগণপতি

মুদ্গলপুরাণ মহাগণপতির ধ্যান দিয়াছে। এই ধ্যানানুসারে মহাগণপতি করিমুণ্ড, ত্রিনেত্র, ইঁহার ললাটে চন্দ্রকলা—বর্ণ লোহিত ইঁহার পত্নী ইঁহার অঙ্কে আসীনা। মহাগণপতি পত্নীর হস্তে পদ্ম। মহাগণপতির দশ হস্ত। মাদুরায় একটি মহাগণপতির মূর্তি আছে। ইঁহার দশ হাত। কিন্তু প্রহরণগুলি অস্পষ্ট। ইন্দুরের উপর ইনি উপবিষ্ট। ইঁহার অঙ্কে দেবী। তিনেভেলি জেলায় বিশ্বনাথ-

মন্দিরে একটি মহাগণপতি মূর্তি আছে। কিন্তু ইঁহার বাহন ইন্দুর ইহাতে নাই। মহাগণপতির হস্তে প্রহরণ থাকা চাই-ই। যেখানে মহাগণপতির সঙ্গে দুই জন দেবী থাকেন সেখানে ইঁহার নাম লক্ষ্মীগণপতি।

অষ্টভুজমূর্তি লক্ষ্মীগণেশ

শুক, দাড়িম, পদ্ম, রত্নখচিত স্বর্ণজলপাত্র, অঙ্কুশ, পাশ, কল্পক-লতা ও বাণের কোরক অষ্টভুজে অবস্থিত। বর্ণ—শ্বেত। অঘোর শিবাচার্য ক্রিয়াক্রমদ্যোতিতে এই বর্ণনাই দিয়াছেন। কিন্তু মন্ত্র-মহোদধি-কার বলেন, লক্ষ্মীগণপতির ত্রিনেত্র, দুই হস্তে দন্ত ও চক্র, এক হস্তে 'অভয়' মুদ্রা—চতুর্থ হস্ত-সম্বন্ধে কোন কথাই বলা হয় নাই। বর্ণ—সুবর্ণাভ, লক্ষ্মী এক হস্তে গণেশকে ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার অপর হস্তে পদ্ম। লক্ষ্মীগণেশের ধ্যান এইরূপ :—

'দন্তাভয়ে চক্রধরৌ দধানং করাগ্রগস্বর্ণঘটং ত্রিনেত্রম্।
ধৃতাব্জয়ালিঙ্গিতমব্ধিপুত্র্যা লক্ষ্মী-গণেশং কনকাভমীড়ে॥'—

মন্ত্রমহোদধি।

'বিভ্রাণশঃ শুকবীজপুরকমলং মাণিক্যকুম্ভাঙ্কুশান্—
পাশং কল্পলতাঞ্চ বাণকলিকা স্রোতঃ সরোনিঃসর (?)।
শ্যামো রক্তসরোরুহেণ সহিতো বিদ্ধম্নয়েনাস্তিকে (?)
গৌরাঙ্গো বরদাদিহস্তকমলো লক্ষ্মীগণেশামহান্॥,—

ক্রিয়াক্রমদ্যোতি।

প্রসন্ন-গণেশ

প্রসন্ন-গণেশের মূর্তি সর্বত্রই দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। এই গণেশের শরীর ঈষৎ বক্রভাবাপন্ন, কিন্তু কোথাও কোথাও আবার এই মূর্তি সরলভাবে দণ্ডায়মান থাকে। গ্রন্থ-বিশেষের মতে মূর্তিটী 'অভঙ্গ' হওয়া আবশ্যক, গ্রন্থান্তর মতে ইহা 'সমভঙ্গ'। যখন ভঙ্গ হইবে তখন সাধারণতঃ ত্রিভঙ্গ। মূর্তি-পদ্মাসনে স্থিত। প্রসন্ন-গণেশের মূর্তি তরুণ অরুণের ন্যায় রক্তাভ

ও রক্তবস্ত্র পরিহিত। ইঁহার দুই হস্তে 'পাশ' ও 'অঙ্কুশ,' অপর দুই হস্তে 'বরদ' ও 'অভয়' মুদ্রা। গ্রন্থে যদিও দুই মুদ্রার কথা লিখিত আছে, কিন্তু কোথাও তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রত্যুত ঐ দুই হস্তে 'দন্ত' ও 'মোদক' থাকে। যেন শুণ্ডে করিয়া তুলিয়া মুখে দিতেছেন এইরূপভাবে মোদকটী স্থিত।

'উদ্যদ্দিনেশ্বররুচিং নিজহস্তপদ্মৈঃ
পাশাঙ্কুশাভয়বরান্দধতং গজাস্যম্।
রক্তাম্বরং সকলদুঃখহরং গণেশং
ধ্যায়েৎ প্রসন্নমখিলাভরণাভিরামম্।'—মন্ত্ররত্নাকর।

হেরম্ব-গণেশ

বিশ্বেশ্বরের অন্যান্য মুর্তি হইতে হেরম্বমুর্তি সম্পূর্ণ পৃথক্। ইঁহার পাঁচটী করিমুণ্ড। চারিটী মুখ চারি দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে, পঞ্চম মুখ চারিটী মুণ্ডের উপর অবস্থিত বলিয়া ঊর্ধ্ব দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে। হেরম্বমুর্তি শক্তিশালী সিংহোপরি অবস্থিত। ইঁহার হস্তে পাশ, দণ্ড, অক্ষমালা, পরশু ও ত্রিমস্তকবিশিষ্ট মুদগর। এক হস্তে 'মোদক' থাকিবে, অপর দুই হস্তে 'বরদ' ও 'অভয়' মুদ্রা, বর্ণ—পীতপ্রভ। ধ্যান এইরূপ :—

'সিংহোপরি স্থিতং দেবং পঞ্চবক্ত্রং গজাননম্।
দশবাহুং ত্রিনেত্রঞ্চ জাম্বুনদসমপ্রভম্॥
প্রসাদাভয়দাতারং পাত্রং পূরিতমোদকম্।
স্বদন্তং সব্যহস্তেন বিভ্রতং চাপি সুব্রতে॥
······করং চাক্ষসূত্রঞ্চ গরশুং মুদগরং তথা।
পাশাঙ্কুশকরাং শক্তিং দেবং লম্বোদরং শুভম্॥
পীবরং চৈকদন্তঞ্চ তুম্বুরূণাম্ গণান্বিতম্।'—শিল্পরত্ন
'বরং তথাঙ্কুশং দন্তং দক্ষিণে চ পরশ্বধঃ।
বামে কপালং বাণাক্ষপাশং কৌমোদকীং তথা॥
ধারয়ন্তং করৈরেভিঃ পঞ্চবক্ত্রং ত্রিলোচনম্।
হেরম্বং মুষকারূঢ়ং কুর্যাৎ সর্বার্থকামদকম্॥'—রূপমণ্ডন।

'অভয়বরদহস্তং পাশদন্তাক্ষমালা- ১
পরশুমথ ত্রিশির্যৈর্মুদ্গরৈর্মোদকঞ্চ।
বিদধতু বরসিংহ পঞ্চমাতঙ্গবক্ত্রঃ
কনকরুচিরবর্ণঃ পাতুহেরম্বনামা ॥"—ক্রিয়াক্রমদ্যোতি।

নৃত্ত-গণেশ

ইহা নর্তনশীল গণেশের মূর্তি। সাধারণতঃ ইনি অষ্টভুজবিশিষ্ট, আবার ছয়টী হস্তও দেখিতে পাওয়া যায়। নৃত্তকালের হাবভাবের সুবিধার জন্য এক হস্ত শূন্য থাকে—ইহাতে কিছুই থাকে না। ইঁহার বর্ণ—পীতপ্রভ। নৃত্তমূর্ত্তি বুঝাইবার জন্য ইঁহার বাম চরণ ঈষৎ বক্রভাবে স্থিত, দক্ষিণ চরণ বক্রভাবে শূন্যে অবস্থিত। প্রধান দুইটী হস্তের মধ্যে দক্ষিণ হস্ত অভয়মুদ্রায় অবস্থিত এবং বাম হস্তটী বাহিরে প্রসারিত অবস্থায় দোদুল্যমান—ইহা গজহস্ত। অন্যান্য হস্তে দন্ত, অক্ষমালা, পরশু, মূলক, মোদকপাত্র, সর্প ইত্যাদি থাকে। আবার ধ্যান-অনুসারে ইঁহার হস্তে থাকে পাশ, অঙ্কুশ, কুঠার, দন্ত, বলয় ও অঙ্গুরীয়। ইঁহার পায়ে নূপুর, কটিতে মেখলা ও কটিসূত্র, হস্তে বলয়, বাহুতে কেয়ুর এবং যজ্ঞোপবীত সর্প। সাধারণতঃ নৃত্ত-গণেশের যে সমুদয় মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়, সেগুলিতে চতুর্ভুজই আছে, গ্রন্থোক্ত অষ্টভুজ নয়।

পূর্ব-ভারতে বিশেষতঃ বঙ্গদেশে নৃত্ত-গণেশের মূর্তি অতি সাধারণ। বাঙলা হইতেই সর্বাপেক্ষা সুন্দর সুন্দর নিদর্শনগুলি পাওয়া গিয়াছে। এগুলির গঠন-নৈপুণ্য ও ভঙ্গী লক্ষ্য করিলে বাঙালী শিল্পীর সুনিপুণ দক্ষতারই পরিচয় পাওয়া যায়। অবশ্য দক্ষিণ-ভারতীয় শিল্প-শাস্ত্রসমূহে নৃত্ত-গণেশের পরিকল্পনা বিশেষ-ভাবেই করা হইয়াছে এবং সেই পরিকল্পনা-অনুসারে দক্ষিণ-ভারতেই নৃত্ত-গণেশের সুন্দর সুন্দর মূর্তি অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া অস্বাভাবিক নহে, কিন্তু সেগুলির তুলনায় বাঙলার বা পূর্ব-ভারতীয় মূর্তিগুলি অধিকতর উৎকৃষ্ট শিল্পনিদর্শন। দক্ষিণ-ভারতীয় শিল্পিগণ

শিবের নটরাজ-মূর্তিকেই বেশী রূপ দিয়াছেন এবং তাহার পরিকল্পনায় বিশেষভাবে মনোযোগী হইয়াছেন, একারণ নৃত্যশীল গণেশের মূর্তিরচনায় তাঁহাদের বিশেষ অবকাশ ঘটে নাই বলিয়াই মনে হয়। এতদ্ব্যতীত নৃত্ত-গণেশের বৈশিষ্ট্য গণেশের সাবলীলতা ও ভঙ্গীর মধ্যে ফুটাইয়া তোলায় খুব কঠিন শিল্প-নৈপুণ্য ও গভীর অনুভব-শক্তির প্রয়োজন হইয়াছে। সম্ভবতঃ এই কঠিন সমস্যায় দক্ষিণ-ভারতীয় শিল্পিগণ বাঙালীর মত কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারেন নাই।

পূর্ব-ভারতীয় মূর্তিশিল্পে নৃত্ত-গণেশের মূর্তিরচনা পাল-রাজত্বকালে (৮০০—১২০০ খ্রীস্টাব্দে) সংঘটিত হইয়াছিল। বাঙলা ও বিহারের বহু নৃত্ত-গণেশের মূর্তি বিভিন্ন মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। কলিকাতা-মিউজিয়ম, পাটনা-মিউজিয়ম, রাজসাহী বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতির মিউজিয়ম, বৃটিশ-মিউজিয়ম প্রভৃতিতে সেগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। দিনাজপুরে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকিঙ্কর ভট্টাচার্য মহাশয়ের গৃহেও একটী সুন্দর নৃত্ত-গণেশের মূর্তি আছে, ভট্টাচার্য-পরিবারে এই মূর্তির পূজা হইয়া থাকে।

শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য মহাশয়ের গৃহে ও রাজসাহী বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতির মিউজিয়মে যে নৃত্ত-গণেশের মূর্তি আছে, সেগুলি উল্লেখ-যোগ্য। এই দুইটী গণেশ এবং বিশেষতঃ নৃত্ত-গণেশের মূর্তি পূর্ণ-বিকশিত পদ্মের উপর নৃত্যপরায়ণ। পদ্মটী পাদপীঠের ঠিক মধ্যস্থলে স্থাপিত। মূর্তির দুই পার্শ্বে দুই জন নারী বাদ্যক্রীড়ায় নিরতা। করতালি ও ঢোল ইহাই তাহাদের বাদ্য। বাহন মূষিক গণেশের পায়ের নিকট অত্যন্ত পুলকিত অবস্থায় অবস্থিত, যেন সে অতিশয় কৌতূহলী হইয়া নৃত্য ও বাদ্য উপভোগ করিতেছে।

গণেশের বিভিন্ন মূর্তি-নিচয়ের মধ্যে নৃত্ত-গণেশের মূর্তিই সর্বাধিক শিল্প নৈপুণ্যের পরিচায়ক। ইহার ধ্যান এইরূপ ঃ—

'পাশাঙ্কুশাপূপকুঠারদন্তচঞ্চৎকরং বলয়ঙ্গুলীয়কম্।
পীতপ্রভং কল্পতরুরুহস্তং ভজামি নৃত্তৈকপদং গণেশম্॥

পুরাণে গণেশ

গণেশ সর্বাগ্রগণ্য দেবতা। সমুদয় দেবদেবীর মধ্যে গণেশের যে একটী বিশিষ্ট স্থান আছে তাহা পূর্বেও বলা হইয়াছে। ভারতীয় পুরাণাদি গ্রন্থে এবং শাস্ত্রসমূহে একথা স্বীকৃত হইয়াছে। পুরাণসমূহে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের পূর্বেও গণেশকে পূজা পইতে দেখা যায়। তিনি সর্ববিঘ্ননাশন, সর্বমঙ্গলকার্যে পূজনীয়।

গণেশের বৈশিষ্ট্য-সম্বন্ধে পূর্বে অনেক কথা বলা হইয়াছে। বর্তমান প্রসঙ্গে তিনি পুরাণসমূহে কিরূপে স্থান পাইয়াছেন তাহাই আলোচনা করিব। অবশ্য পূর্বে পুরাণসমূহ হইতে তাঁহার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উল্লিখিত হইয়াছে বটে, কিন্তু এক্ষণে মাত্র বিভিন্ন পুরাণে তাঁহার সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ উক্তিসমূহ আলোচিত হইবে।

প্রথমে গণেশের জন্ম বা উৎপত্তি ব্যাপার ধরা যাউক। শিবপুরাণে (জ্ঞান ৩২-৩৪ অঃ) গণেশোৎপত্তির এইরূপ বিবরণ পাওয়া যায়—বিবাহ করিয়া শিব ও পার্বতী কৈলাসধামে গমন করিবার পর এক দিন পার্বতী তাঁহার সখীদ্বয় জয়া ও বিজয়ার পরামর্শানুসারে স্নানকালে হস্তে পঙ্ক লইয়া গণেশ নামক অতি সুকুমার এক পুত্রের সৃষ্টি করেন। এই পুত্রকে তিনি নানাবিধ অলঙ্কার ও বস্ত্রে সুশোভিত করিয়া কৈলাসপুরীর দ্বাররক্ষী করিয়া রাখিলেন। গণেশের প্রতি নির্দেশ দেওয়া হইল যে, যে কেহ পার্বতীর গৃহে প্রবেশ করিতে আসিবে, গণেশ তাহাকে বাধা দিবেন। এজন্য পার্বতী গণেশের হস্তে একটী যষ্টি দিলেন।

ইতিমধ্যে সানুচর শিব কৈলাসপুরীতে আগমন করিয়া দ্বারদেশে এক বালককে রক্ষিরূপে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। শিবানুচরগণের ইচ্ছানুসারে গণেশ পথ ছাড়িয়া দিতে সম্মত না হইলে উভয় পক্ষে সঙ্ঘর্ষ বাধিল। পার্বতীও স্বয়ং শিব প্রবেশার্থী জানিয়াও গণেশকে আদেশ দিলেন, হয় গণেশকে পরাজিত করিয়া, না হয় গণেশের নিকট নত হইয়া সানুচর শিব কৈলাসপুরীতে প্রবেশ করিতে পারিবেন।

এদিকে শিবও গণেশকে পার্বতীপুত্র জানিয়াও বিনাশ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। গণেশের সহিত যুদ্ধে শিবানুচরগণ পরাজিত হইয়া বিধ্বস্ত হইল। নারদের মুখে এই অভূতপূর্ব সংবাদ পাইয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ষণ্মুখ (কার্তিকেয়) প্রভৃতি যুদ্ধক্ষেত্রে সমুপস্থিত হইলেন। শিবের বিপদ দেখিয়া তাঁহারা শিবের সহিত সম্মিলিত হন। ব্যাপার দেখিয়া পার্বতীও গণেশকে রক্ষার জন্য দুইটী ভীষণা শক্তির সৃষ্টি করেন। গণেশের বিক্রমের নিকট দেবতারা হতবীর্য হইয়া পড়িলেন। এমন কি, শিব নিজেও ছিন্নাঙ্গ হইলেন। বিষ্ণুও যথেষ্ট নাজেহাল হন, ব্রহ্মার তো লাঞ্ছনার পরিসীমা রহিল না। কিন্তু পরিশেষে বিষ্ণুরই সুদর্শনচক্র গণেশের শিরশ্ছেদন করিল। পার্বতী এই সংবাদ পাইবামাত্র ভীষণভাবে ক্রুদ্ধা হইয়া সহস্র শক্তির সৃষ্টি করিয়া জগৎ সংহার করিতে উদ্যতা হইলেন। তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবপ্রধানগণ উপায়ান্তর না দেখিয়া দেবীর নিকট আসিয়া তাঁহার স্তবে নিমগ্ন হন। দেবীও সন্তুষ্টা হইয়া জানাইলেন যে, গণেশ যদি জীবিত হন এবং দেবতাদের মধ্যে পূজনীয় হইয়া শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করেন, তাহা হইলে তিনি নিবৃত্তা হইবেন। দেবগণ তাহাতেই সম্মত হইলেন। শিবের নির্দেশানুসারে প্রমথগণ উত্তর দিকে উত্তরশিরা অবস্থায় স্থিত জীবের মস্তক আনিবার জন্য বহির্গত হইল। প্রথমেই তাহারা একটী একদন্ত হস্তী দেখিল। ঐ হস্তীর মুণ্ড আনিয়া তাহারা গণেশের স্কন্ধে সংযোজিত করিল। অতঃপর ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের উচ্চারিত মন্ত্রে গজানন গণেশ গাত্রোত্থান করিলেন। গণেশ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের সমমর্যাদা লাভ করিলেন এবং তাঁহাদেরও পূর্বে গণেশের পূজা পাইবার অধিকার হইল।

লিঙ্গপুরাণ-মতে (পূর্ব ১০৫ অঃ) দৈত্যগণজনিত বিঘ্নসমূহ হইতে রক্ষার জন্য দেবতাগণের অনুরোধে শিব গণেশের সৃষ্টি করেন। এখানে গণেশকে শিবেরই রূপান্তরিত পরিগ্রহ বলা হইয়াছে। শিব

উমাগর্ভে গজানন গণপতিরূপ ধারণ করেন, ফলে উমা গণেশকে প্রসব করেন। এই গণেশ কার্তিকেয়ের অগ্রজ। এই পুরাণে ইহাও বলা হইয়াছে যে, দৈত্যগণের বিনাশ এবং দেবতাগণের ও ব্রহ্মবাদী দ্বিজগণের কল্যাণার্থ গণেশের উৎপত্তি।

বৃহদ্ধর্মপুরাণে (মধ্য ৩০ অঃ) দেখা যায় পার্বতী পুত্রকামনা করিলে শিব বস্ত্র হইতে গণেশের সৃষ্টি করেন। পার্বতীর হস্ত হইতে লইয়া শিব যখন এই পুত্রকে দেখিতেছেন, তখন শিবের পাণিতলে অবস্থানকালেই ঐ শিশুর মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়া যায়। এই সময় শিশুর মস্তক ছিল উত্তর দিকে। এই ব্যাপারে পার্বতী শোকাভিভূতা হইয়া পড়িলে শিব তাঁহাকে ছিন্ন মস্তক পুনঃ সংযোজিত করিতে বলিলেন। দেবী তাহা করিতে প্রয়াস পাইলেন বটে, কিন্তু তাহা বিফল হইল। এই সময় দৈববাণী হয়। সেই দেববাণী-অনুসারে অনুচর নন্দীকে শিব উত্তরশিরা অবস্থায় যে কোন জীবের মুণ্ড আনিবার আদেশ দিলেন। নন্দী ত্রিভুবন ঘুরিয়া অমরাবতীতে আসিয়া ইন্দ্রের ঐরাবত হস্তীকে উত্তরশিরা অবস্থায় শয়ান দেখিলেন এবং তাহার মস্তকছেদনে উদ্যত হইলেন। ঐরাবতের গর্জনে ইন্দ্রাদি দেবগণ আসিয়া পড়িলেন। ইন্দ্রের সহিত নন্দীর যুদ্ধ বাধিল। ইন্দ্রকে পরাজিত করিয়া নন্দী ঐরাবতের ছিন্ন শির আনিয়া শিবকে উপহার দিলেন। শিব ঐ মস্তক পুত্রের স্কন্ধে সংযোজন করিলেন। পুত্র জীবন লাভ করিলেন এবং এইরূপে গজানন গণেশের উৎপত্তি হইল।

বামনপুরাণ-মতে (৫৪ অঃ) স্নানকালে গৌরী আপনার দেহ-মল হইতে চতুর্ভুজ, বিশালবক্ষঃ ও লক্ষণান্বিত গজানন বিনায়কের সৃষ্টি করেন। কিন্তু গৌরী তাঁহাকে উৎসর্জনপূর্বক স্নান সমাপন করিয়া বাহিরে আসেন। অতঃপর সেই স্থানে শিব স্নান করিতে আসিয়া গণেশকে আবিষ্কার করিলেন। এখানে শিব পার্বতীর নায়ক হইলেও নায়কব্যতীত গণেশের জন্ম হওয়ায় শিব তাঁহার নাম দিলেন—বিনায়ক।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের আখ্যান আবার অন্যরূপ। তাহাতে (গণেশ ১০-১২ অঃ) দেখা যায়, গণেশ শ্রীকৃষ্ণের অবতার। পার্বতী পুণ্যকব্রত অবলম্বন করায় শ্রীকৃষ্ণকে পুত্ররূপে লাভ করিয়াছিলেন। গণেশের জন্মোৎসবে সমুদয় দেবদেবীর কৈলাসে সমাবেশ হইল; সকলেই পুত্র দেখিয়া ধন্য হইলেন। কিন্তু সূর্যতনয় শনি কোন দিকে না দেখিয়া অধোমুখে থাকায় পার্বতী তাঁহাকে পুত্র দেখিতে অনুরোধ করেন। শনি অমঙ্গল আশঙ্কায় তাহা করিতে না চাহিলে পার্বতী তাঁহাকে আশ্বাস দেন। তখন শনি নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও গণেশের মুখ দেখিবামাত্র শিশুর মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গোলোকে শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমন করিল। দেবী শোকাভিভূতা হইয়া মূর্ছিতা হইলেন--দেবগণের মধ্যে বিষাদের ছায়া পতিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ গরুড়পৃষ্ঠে উত্তর দিকে পুষ্পভদ্রা-তীরে গমনপূর্বক একটা হস্তী দেখিয়া তাহার মস্তক সুদর্শনচক্রদ্বারা ছেদন করিয়া আনিলেন এবং তাহা গণেশের স্কন্ধে সংযোজিত করিয়া দিলেন। মৃত গণেশের দেহে পুনরায় প্রাণসঞ্চার হইল। শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশে গজানন গণেশ দেবতাদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য হইলেন। সমুদয় দেবদেবী ও জীবগণ-কর্তৃক তিনি নানাবিধ উপচারে ও উপহারে পূজিত ও সম্মানিত হইলেন। এই কাহিনীটীর প্রচলন কৃষ্ণ-গণেশসংস্কৃতিপন্থিগণের মধ্যেও প্রচলিত। পূর্বেও বাল-গণেশের উৎপত্তি-প্রসঙ্গে এই কাহিনীটী বর্ণিত হইয়াছে।

গণেশের উৎপত্তি-সম্বন্ধে বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্ন কাহিনী প্রচলিত থাকিলেও তাঁহার বৈশিষ্ট্য ও দেবগণের মধ্যে স্থান-সম্বন্ধে প্রায় একই নির্দেশ দেখা যায়। সর্বত্রই তিনি সর্বাগ্রগণ্য, অগ্রে পূজ্য দেবতা। তিনি বিঘ্ননাশন এবং সর্বমঙ্গলকার্যের বিধায়ক।

শিবপুরাণে দেখা যায়—আদিদেব বিষ্ণু, প্রকৃতিদেবী, দেবদেব শঙ্কর, সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মা সূর্য ও গণেশ— এই পাঁচ জন পূজনীয়।

'বিষ্ণুর্দেবঃ শ্রুতঃ পূর্বঃ প্রকৃতিঃ পরমা শুভা।
শঙ্করস্তপরো দেবঃ সূর্যস্তু ত্রিগুণাত্মকঃ ”
গণেশস্তত্র পঙ্‌ক্তৌ হি পূজ্যো……
শিবপুরাণ, জ্ঞান ৩২. ৫-৬

শিবপুরাণে আরও বলা হইয়াছে যে, গণেশ সকলের পূজ্য গণাধ্যক্ষ। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর যেমন পূজনীয় ও প্রথমে পূজ্য, গণেশও তদ্রূপ—এমন কি তাঁহাদেরও পূর্বে গণেশ পূজা পাইয়া থাকেন। গণেশের পূজা না করিয়া তাঁহাদিগের পূজা করিলে সেই পূজায় অল্প ফল হইয়া থাকে। গণেশের মুখে সিন্দূর রেখা বর্তমান, এই জন্য সিন্দূর দিয়া তাঁহার পূজা হয়। যে ব্যক্তি গন্ধপুষ্প-নৈবেদ্যাদিদানে তাঁহার পূজা করিয়া নীরাজনা কার্য করিয়া প্রদক্ষিণ করে, অথবা মাত্র নমস্কারদ্বারা উপাসনা করে, তাহার সর্বাভীষ্ট সিদ্ধ হয়।—ঐ, ৪৪. ৪২-৫৭

লিঙ্গপুরাণেও (পূর্ব ১০৫. ১৬ ইঃ) বর্ণিত হইয়াছে যে, গণেশ ত্রিজগতে লোকের বন্দনীয় ও পূজনীয়। যে ব্যক্তি দক্ষিণাহীন যজ্ঞ করে, গণেশ স্বর্গপথে থাকিয়া তাহার ধর্মবিঘ্ন করিতে প্রবৃত্ত হন। যে ব্যক্তি অন্যায় পথ অবলম্বন করিয়া অধ্যয়ন, অধ্যাপন, ব্যাখ্যান ও কর্মানুষ্ঠান করে, গণেশ নিয়ত তাহার প্রাণসংহারে ব্যাপৃত থাকেন। স্ববর্ণত্যাগী ও স্বধর্মরহিত নরনারীগণের প্রাণ হরণ করিয়া তাহাদিগকে সমুচিত প্রতিফল দেওয়া গণেশের কার্য। যে স্ত্রী ও পুরুষ নিয়ত তাঁহার পূজায় রত থাকে, তাহারা গাণপত্যাদিতে ক্ষান্ত হইবে না। যুবক বা বৃদ্ধ যে কেহ তাঁহার ভক্ত হউন না কেন, তিনি ভক্তকে ইহলোকে ও পরলোকে পালন করিয়া থাকেন। যে কেহ ব্রহ্মা, বিষ্ণু বা মহেশ্বরের পূজা বা তাঁহাদের উদ্দেশ্যে অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ করুন না কেন, তাঁহাকে বিঘ্ননিবারণের জন্য প্রথমে গণেশের পূজা করিতে হইবে। কোন ব্যক্তি গণেশের পূজা না করিয়া কোন কল্যাণজনক শ্রৌত স্মার্ত বা লৌকিক কার্য করিলে তাহার কল্যাণ

অকল্যাণে পরিণত হয়। সর্বক্ষেত্রেই তিনি বিঘ্ননাশন। কি দেবতা, কি মানব, সকলেরই তিনি বিপদ ভঞ্জন করিয়া থাকেন। এজন্যই তাঁহার নাম—বিঘ্নগণেশ্বর। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—সকলেই সিদ্ধিকামনায় তাঁহার পূজা করিয়া থাকে।

শিবপুরাণে (জ্ঞান. ৩৪. ৫৮ইঃ) সকলের পূজালাভের ও বিঘ্ন-নাশনের মর্যাদা লাভ করিয়া গণেশ শিবের গণাধ্যক্ষ হন। বিঘ্ননাশন হওয়ায় তিনি 'বিঘ্নহর্তা' নাম লাভ করেন (ঐ, ৫৮)। এই পুরাণে (ঐ ৬২.৮৮) এইরূপ কথিত হইয়াছে—কার্তিক মাসের কৃষ্ণা চতুর্থী তিথির প্রথম প্রহরে পার্বতী গণেশকে উৎপাদন করেন। এজন্য তাঁহার চতুর্থী ব্রত করণীয়। ঐ চতুর্থী হইতে বর্ষান্তে আবার উক্ত চতুর্থী পর্যন্ত তাঁহার ব্রত হইয়া থাকে। যাহারা সংসারে অসীম সুখ কামনা করে, তাহাদিগের উক্ত চতুর্থী তিথিতে গণেশকে পূজা করা উচিত। অগ্রহায়ণ মাসের যে কৃষ্ণা চতুর্থী, ঐ দিনে পূজারী প্রাতঃস্নান করিয়া ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিবে এবং উপবাসী থাকিয়া রাত্রির প্রথম প্রহরে পুনরায় স্নান করিয়া গণেশের ধাতুময়ী, প্রবালসম্ভূতা, শ্বেত অর্কনির্মিতা, বা মৃণ্ময়ী মূর্তি নির্মাণ করিয়া প্রতিষ্ঠা করিবে। অতঃপর যথাবিহিত গন্ধপুষ্পাদি অর্ঘদানে এবং ত্রিপত্র, অগ্রশালী ও দূর্বাদল দ্বারা তাঁহার পূজা করিতে হয়। ইহার পর স্তব নমস্কারাদি দ্বারা কিরীটস্থ বালচন্দ্রের পূজা করা বিধেয়। অতঃপর নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণকে পূজা করিয়া ও মিষ্টান্নাদি খাওয়াইয়া নিজে মধুর ও লবণরসবর্জিত ভোজন গ্রহণ করিবে। তদন্তর প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয়। ইহাই গণেশের ব্রত। বর্ষান্তে ব্রতসমাপন করিলে উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান করণীয় ; ইহাতে দ্বাদশটী ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইতে হয় ও একটী ঘটে গণেশের মূর্তি ধারণা করিতে হয়। অতঃপর অগ্নি-সংযোগে পদ্মদ্বারা হোম করা নিয়ম। এই মূর্তিসন্নিধানে দুইটী নারী ও দুইটী বালককেও পূজা করিয়া ভোজন করাইতে হয়। অতঃপর ব্রতানুষ্ঠাতা সেই রাত্রি জাগরণে কাটাইয়া প্রাতঃকালে

পুনরায় ঐ নারীদ্বয় ও বালকদ্বয়কে ভোজন করাইবে। ইহার পর সে ব্রতসম্পূরণার্থ পুষ্পাঞ্জলি দিয়া স্বস্তিবাচনপূর্বক ব্রাহ্মণের নিকট আশীর্বাদ ও হোমতিলক গ্রহণ করিবে এবং নমস্কার করিয়া মনে নানা অভীষ্ট প্রার্থনা করিবে। এইরূপ ব্রত করিলে অভীষ্ট ফল লাভ হয়। যথাবিহিত নিত্য গণেশের পূজা করিলেও অভীষ্টসিদ্ধি ও বিঘ্ননাশ হইয়া থাকে। লিঙ্গপুরাণের মত এই পুরাণেও চতুর্বর্ণ-কর্তৃক গণেশের পূজা নির্দিষ্ট হইয়াছে। নানাবিধ কার্যসিদ্ধির জন্য স্ত্রীলোক এবং উন্নতিকামী নৃপতি গণেশের পূজা করিবেন।

বৃহদ্ধর্মপুরাণে (মধ্য· ৩০, ৮০) গণেশ সর্বদেবতাগণ মধ্যে সর্বাগ্রে পূজ্য বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। তিনি সংসারবিমুখ পরম যোগী। এই পুরাণে গণেশের এই প্রকার রূপবর্ণনা আছে ঃ—ছিন্নমুণ্ড গণেশের স্কন্ধে হস্তিমুণ্ড যোজনা করিবামাত্র তিনি অতি সুন্দর, খর্ব, স্থূলতর, গজেন্দ্রবদনাম্বুজ, জবাকুসুমসঙ্কাশ, মৃগাঙ্কধবলানন চতুর্বাহু, প্রস্যন্দন্মদগন্ধলুব্ধমধুপশোভিত ও মহাদ্ভুতলোচনরূপে বিরাজ-মান হইলেন।

'শিরোযোজনমাত্রেণ বালঃ সোঽপ্যতিসুন্দরঃ।
খর্বস্থূলতরো দেবো গজেন্দ্রবদনাম্বুজঃ ॥
জবাকুসুমসঙ্কাশো মৃগাঙ্কধবলাননঃ।
চতুর্বাহুঃ স্রবদ্দানগন্ধলুব্ধালিশোভিতঃ।
রেজে শিবসমীপস্থো মহাদ্ভুতবিলোচনঃ ॥—মধ্য, ৩০, ৭৬-৭।

এই পুরাণে (মধ্য, ৩০, ৮৯-৯০) এইরূপ বলা হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি যাত্রাকালে অথবা পুণ্যকার্যারম্ভে গণপতিকে স্মরণ করে তাহার যাত্রাকার্য সফল হয়; সমস্ত মঙ্গলকার্যেই এই গণাধিপের পূজা করিতে হয়, তাহা হইলে সমুদয় দেবতা পূজিত হইয়া কার্যসাধক হন।

বৃহদ্ধর্মপুরাণে (মধ্য, ৩০, ১০০-৬) কথিত গণেশের ৫০টী নাম এইরূপ—(১) গণেশ, (২) গণনাথ, (৩) হেরম্ব, (৪) গিরিশাত্মজ,

(৫) পার্বতীনন্দন, (৬) বীর, (৭) দেবরাজ, (৮) গজানন, (৯) লম্বোদর, (১০) বিঘ্নরাজ, (১১) যোগী, (১২) সদ্‌যোগলক্ষণ, (১৩) অগ্রপূজ্য, (১৪) চতুর্বাহু, (১৫) একদন্ত, (১৬) লিপীশ্বর, (১৭) ব্যাঘ্রচর্মাম্বর, (১৮) ধীর, (১৯) মঙ্গলরূপবান্, (২০) শুক্লাস্য, (২১) মূষিকারোহী, (২২) মোক্ষদায়ক, (২৩) দন্তকর, (২৪) দন্তী, (২৫) বৈষ্ণব, (২৬) পরমার্থদৃক্ (২৭) পঞ্চপাণি, (২৮) পঞ্চবক্ত্র, (২৯) শিব, (৩০) শঙ্কর, (৩১) ঈশ্বর, (৩২) হারগত, (৩৩) নৃত্যকারী, (৩৪) শিব-পুত্র, (৩৫) প্রবন্মদ, (৩৬) আনন্দানন্দ, (৩৬) অতিমনা, (৩৮) শৈব, (৩৯) ধর্ম, (৪০) ধনেশ্বর, (৪১) অনন্ত, (৪২) জগদাধার, (৪৩) শশিসূর্যলোচন, (৪৪) সমুদ্রপাতা, (৪৫) সমুদ্রজঠর, (৪৬) অজয়, (৪৭) দিব্যরূপ, (৪৮) বারিনাথ, (৪৯) জয়, এবং (৫০) বিজয়া।

গণেশের এই পঞ্চাশং নাম যে ব্যক্তি যাত্রাকালে, পূজায় ও দানকালে, শ্রাদ্ধে, গঙ্গাস্নানে অথবা পুত্রাদির মঙ্গলকার্যে কিংবা প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যা পাঠ করে বা ভক্তিমান্ হইয়া শ্রবণ করে, তাহার বিঘ্ন দূর হয়, ধনপুত্রাদির মঙ্গল হয় এবং ইষ্টদেবে ভক্তি ও বাঞ্ছিত অর্থলাভ হইয়া থাকে (ঐ, ১০৬-৭)। নন্দী ইন্দ্রকে জয় করিয়া ঐরাবতের মস্তক আনয়ন করিয়া দিলে সেই মস্তক গণেশের স্কন্ধে সংযোজিত হয়। ঐরাবত ছিল একদন্ত, এজন্য ব্রহ্মা গণেশের নাম 'একদন্ত' রাখেন (ঐ, ৮৬)। এতদ্ব্যতীত ব্রহ্মা তাঁহার বীজরূপ নাম দিলেন 'হেরম্ব' ও নিন্দনীয়ভাবে নাম দিলেন 'লম্বোদর' (ঐ, ৭৯) এবং বিঘ্নরাশি নাশ করেন বলিয়া নাম দিলেন 'বিঘ্নেশ' (ঐ, ৮৮)।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে (গণেশ, ১৩ অঃ) গণেশের বিষ্ণু-কর্তৃক প্রদত্ত নামের সংখ্যা আটটী—(১) বিঘ্নেশ, (২) গণেশ, (৩) হেরম্ব, (৪) গজানন, (৫) লম্বোদর, (৬) একদন্ত, (৭) শূর্পকর্ণ, এবং (৮) বিনায়ক। ৪৪ অঃ 'বিনায়ক' নামের পরিবর্তে 'গুহাগ্রজ'। এই পুরাণে নামাষ্টকের এইরূপ অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে :—গ-শব্দের অর্থ

জ্ঞান,-ণ-শব্দের অর্থ মুক্তি। গণেশ এই উভয় প্রদানে সমর্থ এবং পরব্রহ্মস্বরূপ। এক শব্দের অর্থ—প্রধান, দন্ত-শব্দের অর্থ—বল। একদন্ত=প্রধান বলসম্পন্ন। হে-শব্দের অর্থ দীন, রম্ব-শব্দের অর্থ অর্থ পালক। বিঘ্ন-শব্দের অর্থ বিপদ্, নায়ক শব্দের অর্থ খণ্ডন; বিনায়ক=বিপদনাশক। পূর্বে বিষ্ণুপ্রদত্ত নৈবেদ্য ও পিতৃদত্ত নানাবিধ ভোগে যাঁহার উদর লম্বমান তিনি লম্বোদর। যাঁহার শূর্পাকৃতি কর্ণদ্বয় বিঘ্ননিবারণের কারণ এবং যিনি সম্পদ্ ও জ্ঞান-স্বরূপ তিনি শূর্পকর্ণ। মুনিপ্রদত্ত বিষ্ণুর নিবেদিত পুষ্পও গজেন্দ্র-বদনযুক্ত। গুহ অর্থাৎ কার্তিকেয়ের অগ্রে মহাদেবের ভবনে আবির্ভূত হইয়াছেন বলিয়াই সকল দেবের অগ্রে পূজিত দেব গুহাগ্রজ।

বৃহদ্ধর্মপুরাণে (মধ্য. ৩০. ৮১) দেখা যায়, গণেশকে সরস্বতী—লেখনী, ব্রহ্মা—জপমালা, ইন্দ্র—গজদন্ত, লক্ষ্মী—পদ্ম, শিব—ব্যাঘ্রচর্ম, বৃহস্পতি—যজ্ঞসূত্র এবং পৃথিবী—মূষিক বাহন প্রদান করেন। আবার ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে (গণেশ, ১৩ অঃ) উল্লিখিত হইয়াছে যে, গণেশ ধর্মের নিকট হইতে সিদ্ধাসন, ব্রহ্মার নিকট হইতে কমণ্ডলু, শঙ্করের নিকট হইতে যোগপট্ট ও সুদুর্লভ তত্ত্বজ্ঞান, ইন্দ্রের নিকট হইতে রত্নসিংহাসন, সূর্যের নিকট হইতে মণিনির্মিত কুণ্ডদ্বয়, চন্দ্রের নিকট হইতে মাণিক্যমালা, কুবেরের নিকট হইতে কিরীট, অগ্নির নিকট হইতে বহ্নিশুদ্ধ বস্ত্র, বরুণের নিকট হইতে রত্নছত্র, বায়ুর নিকট হইতে রত্নাঙ্গুরীয়ক, লক্ষ্মীর নিকট হইতে ক্ষীরোদসমুদ্রজাত শ্রেষ্ঠ রত্নখচিত বলয়, নূপুর ও কেয়ূর, সাবিত্রীর নিকট হইতে কণ্ঠভূষা, ভারতীর নিকট হইতে উজ্জ্বল হার এবং বসুন্ধরার নিকট হইতে উজ্জ্বল হার এবং বসুন্ধরার নিকট হইতে বাহনের জন্য মুষিক লাভ করিয়াছিলেন।

অগ্নিপুরাণের ৭১তম অধ্যায় গণেশপূজাসম্বন্ধীয়। ইহাতে গণেশ-পূজার নিয়ম লিখিত আছে। এখানে উল্লিখিত গণেশের বিভিন্ন নাম—একদংষ্ট্র, গজকর্ণ, গজবক্ত্র, মহোদর, স্বদন্তহস্ত, গণোগুরু, শক্ত্যনন্ত,

লম্বোদর, দন্তী, গণপতি, গণাধিপ, গণেশ, গণনায়ক, গণক্রীড়, মহাদেব, লম্বকুক্ষি, বিকট, বিঘ্ননাশন, ধূম্রবর্ণ। গণেশের পূজায় পদ্মকর্ণিক বীজগণের ও জ্বালিনী শক্তির পূজা করিতে হয়। ইঁহার পূজাব্যপদেশে অন্যান্য পূজ্যা শক্তি—সূর্যেশা, কামরূপা, উদয়া, কামবর্তিনী, সত্যা, বিঘ্ননাশা এবং গন্ধমৃত্তিকা।

অগ্নিপুরাণের ৩১৮তম অধ্যায়েও গণপূজার নিয়ম বর্ণিত আছে। এই পুরাণেই ২৬৬তম অধ্যায়ে বিনায়ক-স্নানবর্ণনায় গণেশের বৈশিষ্ট্য কথিত হইয়াছে। এখানে বলা হইয়াছে যে, বিনায়ক বিঘ্ননাশের জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর-কর্তৃক গণাধিপত্যে নিয়োজিত হন। বিনায়ক-কর্তৃক উপসৃষ্ট হইলে মানব স্বপ্নযোগে অতিশয় জলাবগাহন করে, নিজ মস্তক মুণ্ডিত দেখে, ক্রব্যাদ্‌গণের স্কন্ধে আরোহন করে এবং চলিবার সময় আপনাকে পর কর্তৃক অনুগত বলিয়া মনে করে। তাহার সকল উদ্যম বিফল হয়, অকারণে শারীরিক ও মানসিক ক্লেশ উপস্থিত হয়, তাহার কন্যা বর লাভ করিতে পারে না। বরাঙ্গনাগণ অপত্যলাভে বঞ্চিত হন, শ্রোত্রিয় আচার্যত্ব লাভ করিতে পারে না, শিষ্য অধ্যয়ন করিতে পান না, ধনী ব্যক্তি রাজ্য লাভ করিতে পারেন না। এই সমুদয় কারণে গণপতির স্নান ও পূজা করা উচিত। আশ্বিন মাসে বুধবারে দ্বাদশী তিথিতে হস্তা ও পুষ্যা নক্ষত্রে শুভস্থানে গণমূর্তি স্থাপনপূর্বক আজ্যমিশ্রিত গৌরসর্ষপ বল্কদ্বারা গাত্র মার্জন করিয়া এবং সর্বৌষধি ও সর্বগন্ধ লেপন করিয়া চারি কলস জল প্রদান করিতে হইবে। ইহার পর অশ্বস্থান মৃত্তিকা, বল্মীকমৃত্তিকা, হ্রদমৃত্তিকা, গোরোচনা, কুঙ্কুম, গুগ্‌গুলাদি দিয়া দুর্ভাগ্যনাশের, ষড়ৈশ্বর্যলাভের ও পবিত্রতালাভের জন্য প্রার্থনা করিতে হয়। অতঃপর বাম হস্তে দর্ভপাত্র গ্রহণ করিয়া কুশাগ্রধারণপূর্বক উড়ুম্বরীয় স্রুবদ্বারা হোম করিতে হইবে। তদনন্তর যথাবিহিত পূজা করিয়া রূপ, যশ, সৌভাগ্য, পুত্র, ধন এবং সর্বাভীষ্ট—এই সমুদয় প্রার্থনা করিয়া ব্রাহ্মণগণকে অন্নবস্ত্রদ্বারা পরিতুষ্ট করিতে হয়।

শিবপুরাণে (জ্ঞান ৩৬.৮) গণেশের দুই পত্নী—সিদ্ধি ও বুদ্ধি। এই পুরাণে (ঐ, ৩৫-৬ অঃ) গণেশের বিবাহের অতি সুন্দর আখ্যানও পাওয়া যায়। গণেশ ও কার্তিক উভয়ে পিতামাতার নিকট বিবাহ করিবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিলে হরপার্বতী তাঁহা-দিগকে নির্দেশ দেন যে, দুই ভ্রাতার মধ্যে যিনি প্রথমে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া প্রত্যাগমন করিবেন তাঁহারই প্রথমে বিবাহ হইবে। ইহাতে কার্তিকেয় পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিবার জন্য তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া পড়েন, কিন্তু গণেশ পিতামাতাকে পূজা করিয়া ও তাঁহাদিগকে সাতবার প্রদক্ষিণ করিয়া পৃথিবী-প্রদক্ষিণের ফল লাভ করেন এবং ফলে তাঁহারই প্রথমে বিবাহ হইল। সিদ্ধি ও বুদ্ধিকে তিনি বিবাহ করিলেন। কার্তিকেয় ফিরিয়া আসিয়া এই ব্যাপার দেখিয়া অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন এবং ক্রৌঞ্চ পর্বতে গিয়া বাস করিতে থাকেন ; তদবধি তিনি অবিবাহিত।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের গণেশখণ্ডের ১৩শ অধ্যায়ে গণেশের স্তব লিখিত হইয়াছে। ইহাতে বলা হইয়াছে—বিঘ্নেশ গণেশ ব্রহ্মরূপ সর্বসিদ্ধির আশ্রয়। গণেশ-পূজার মন্ত্র সকল প্রকার অভীষ্ট ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের ফলদায়ক সর্ববিধ সিদ্ধিদায়ক। গণেশমন্ত্র পঞ্চলক্ষবার জপ করিলে সাধকের মন্ত্রসিদ্ধি হইয়া থাকে। যাঁহার মন্ত্রসিদ্ধি হয় তিনি বিষ্ণুর সহিত অভিন্ন হন। গণেশের নাম স্মরণ করিলে বিঘ্নসকল দূরে অপসৃত হয় এবং স্মরণকারী বাগ্মী, মহাসিদ্ধ ও সর্বপ্রকার সিদ্ধিযুক্ত হন। তাঁহার সাক্ষাতে বৃহস্পতি জড়তা প্রাপ্ত হন এবং যিনি তাঁহার সাক্ষাৎলাভ করেন তিনি সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী, গুণী ও পণ্ডিত হইয়া থাকেন। গণেশ সকল দেব ও সিদ্ধগণের শ্রেষ্ঠ, যোগিগণের গুরু, সর্বরূপ সকলের ঈশ্বর এবং জ্ঞানরাশিস্বরূপ। তিনি অব্যক্ত, অক্ষয়, নিত্য, সত্য ও আত্মস্বরূপ। বায়ুর মত তিনি নির্লিপ্ত, অক্ষত ও সর্বসাক্ষী। সংসারসাগরে তিনি দুর্লভ কর্ণধার-রূপে মায়াচ্ছন্ন জীবগণকে পার করেন। তিনি ধ্যানাতিরিক্ত, ধ্যান-

দ্বারা দুর্জেয়, অথচ ধ্যেয়। তিনি ধার্মিক, ধর্মস্বরূপ, ধর্মজ্ঞ এবং ধর্ম ও অধর্মের ফলদাতা। তিনি সংসারবৃক্ষের বীজ ও তদাশ্রিত অঙ্কুর। তিনি অতীন্দ্রিয় এবং স্ত্রী, পুত্র ও নপুংসকের স্বরূপ। আপন ইচ্ছানুসারে কখনও তিনি সগুণ এবং কখনও নির্গুণ ব্রহ্মরূপে অবস্থান করিয়া থাকেন। তিনি প্রকৃতির ন্যায় সাম্যাবস্থাপ্রাপ্ত, প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন, অথচ প্রকৃতি হইতে বিভিন্ন। চারি বেদ, এমন কি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও সরস্বতী তাঁহার স্তবে অক্ষম।

এইভাবে যিনি গণেশের স্তব করেন তাঁহার সর্ববিধ কল্যাণ বর্ধিত হয় এবং সকল প্রকার বিঘ্নের বিনাশ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি যাত্রাকালে ভক্তিপূর্ব্বক এই স্তব পাঠ করিয়া গমন করে, তাহার সকল প্রকার অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। দুঃস্বপ্ন দেখিয়া এই স্তব পাঠ করিলে সুস্বপ্ন হইয়া থাকে। এই স্তব পাঠ করিলে কখনও ভয়ঙ্কর গ্রহপীড়া হয় না। ইহাতে শক্রনাশ, বন্ধুবৃদ্ধি, বিঘ্ননাশ ও নিত্য সম্পৎবৃদ্ধি হয়। এই স্তব পাঠের ফলে পুত্রপৌত্রানুক্রমে গৃহে লক্ষ্মী স্থিরা হন, পাঠকারী সর্বপ্রকার ঐশ্বর্য লাভ করেন। পাঠকারী সর্বতীর্থের সর্বযজ্ঞের ও সর্ববিধ দানের ফল লাভ করেন।

স্তব-মাহাত্ম্যের পর কবচের বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হইয়াছে। বিনায়কের কবচ ত্রিলোকে দুর্লভ, পুরাণসমূহে অতি গোপনীয় ও আগমনিচয়ে দুষ্প্রাপ্য। এই কবচ সর্ববিঘ্ননাশক এবং সামবেদের কৌথুমশাখায় সমর্থিত। গণেশ যেমন নিত্য এবং তিনি যেমন আপন ইচ্ছানুসারে মায়াদ্বারা আবির্ভূত ও তিরোভূত হন, তাঁহার কবচেরও তাহাই বৈশিষ্ট্য। তাঁহার পূজা ও স্তোত্র নিত্য এবং প্রতি কল্পেই বর্তমান থাকে। বিষ্ণুর মত গণেশও অবতারে অবতারে পার্বতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার কবচ ধারণ করিলে মুনিগণ জীবন্মুক্ত ও দেবগণ ভীতিশূন্য হন। গণেশ-কবচধারী মৃত্যুভয়ে ভীত হন না—আয়ুক্ষয়, অমঙ্গল ও কুত্রাপি পরাজয় ঘটে না। দশ লক্ষবার জপ করিলে যাঁহার কবচ সিদ্ধ হয় তিনি মৃত্যুঞ্জয় হন। কবচ গ্রহণমাত্রেই

বাগ্মী, চিরজীবি, সর্বত্রবিজয়ী ও পূজ্য হওয়া যায়। এই পবিত্র কবচ মালামন্ত্রদ্বারা নির্মিত। ইহার ধারণে সর্বপাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে। ভূত, প্রেত, পিশাচ, কুষ্মাণ্ড, ব্রহ্মরাক্ষস, ডাকিনী, বেতাল প্রভৃতি অপদেবতা, বালকদিগের পীড়াদায়ক গ্রহ, ক্ষেত্রপাল প্রভৃতিও কবচধারণে আধি, ব্যাধি, মোহ, শোক প্রভৃতিও কবচধারণে অপসারিত হয়। খলস্বভাব ব্যক্তিকে ও পরশিষ্যকে এই কবচ দান করিলে দানকারীর তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হইয়া থাকে। এই কবচের ঋষি প্রজাপতি, ছন্দোবৃহতী এবং লম্বোদর দেবতা। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষবিষয়ে ইহার নিয়োগ হয়। এই কবচ সকল কবচের সারভূত।

অতঃপর গণেশের মন্ত্র। এই মন্ত্রে তিনি রক্ষাকর্তৃ-ও ত্রাণকর্তৃ-রূপে বর্ণিত হইয়াছেন।

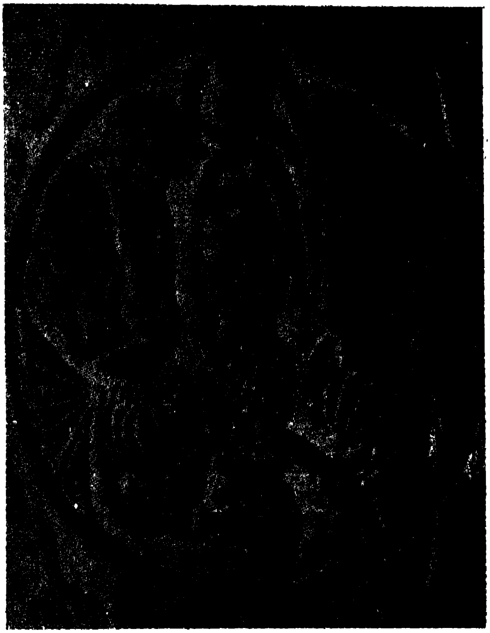
কয়েকটী পুরাণে গণেশের মন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়। গরুড়পুরাণ-(পূ. ১৮৯.১) মতে গণেশের মন্ত্র 'আং গং গণপতয়ে স্বাহা ইতি'। এই মন্ত্র 'ধনবিদ্যা-প্রদায়কঃ' (ঐ)। এই মন্ত্র ১০০৮ বার জপ করিয়া শিখাবন্ধন করিলে ব্যবহারে জয়লাভ হয়। শতবার জপ করিলে সর্বজনের প্রিয় হইতে পারা যায় (ঐ, ২)। এই পুরাণ বলেন যে, এই মন্ত্রদ্বারা রাজাকেও বশ করিতে পারা যায়। কৃষ্ণতিল ঘৃতাক্ত করিয়া তিন দিন ১০০৮ বার হোম করিলে রাজা বশীভূত হন। অষ্টমী ও চতুর্দশীতে উপবাস করিয়া বিঘ্নরাজের পূজা করিয়া তিল ও তণ্ডুল মিশ্রণপূর্বক ১০০৮ হোম করিলে সর্বত্র বিজয়ী হইতে ও সর্বত্র সেবা পাইতে পারা যায়। এই মন্ত্র ১০০৮ বার জপ করিয়া শিখাবন্ধন করিলে রাজকুলেও ব্যবহারে জয়লাভ হইয়া থাকে (ঐ, ৩-৫)। গরুড়পুরাণে (পূ. ২৪.৯) শক্তিমূর্তির অর্চনা করিয়া বিঘ্নরাজের অর্চনার কথা বলা হইয়াছে।

দেবীভাগবতে (৯.১.১) পঞ্চপ্রকৃতির নাম করিবার সময় অন্যতমা প্রকৃতি দুর্গাকে 'গণেশজননী' ('গণেশ-জননী দুর্গা, রাধা, লক্ষ্মী, সরস্বতী' বলা হইয়াছে।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে (৪৪'২৬ই.) উক্ত হইয়াছে—গণেশ জিতেন্দ্রিয়-গণের অগ্রগণ্য বলিয়া মক্ষিকা পর্যন্ত বিনাশ করেন না। ইনি কৃষ্ণের অংশভূত এবং ইহার তেজ কৃষ্ণের সমান। অপর দেবগণ কৃষ্ণের কণামাত্র বলিয়া প্রথমে ইহারই পূজা হইয়া থাকে।

স্কন্দপুরাণের মাহেশ্বরখণ্ডের কেদারখণ্ডের একাদশ অধ্যায়ে মহেশের উক্তিতে গণেশপূজার বিবরণ পাওয়া যায়। এই বিবরণ নিম্নোক্তরূপ—

উভয়পক্ষের চতুর্থী তিথিতে গণেশের অর্চনা করিতে হয়। শুক্ল-পক্ষে বিশুদ্ধ শুক্ল তিল দ্বারা স্নান করিয়া অন্যান্য আবশ্যক সমস্ত কার্য নির্বাহের পর গন্ধ, মাল্য ও অক্ষতাদি দ্বারা সযত্নে গণেশ-পূজা করিবার বিধি আছে। পূজা আরম্ভ করিয়া যথাবিধি গণেশের ধ্যান করিতে হয়। মহাদেবের ন্যায় গণেশেরও বহু আগম আছে; সেই-জন্য সত্ত্বরজস্তমোগুণ ভেদে বহুবিধ উপাসক-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। গণভেদে বহুবিধ নাম নিরুক্ত হইয়া থাকে; যথা—পঞ্চবক্ত্র, গণাধ্যক্ষ, দশবাহু, ত্রিলোচন, কমনীয়, স্ফটিকনিভ, নীলকণ্ঠ এবং গজানন। গণেশের মুখ পঞ্চবিধ। তাঁহার মধ্যম মুখ গৌরবর্ণ। উহা চতুর্দণ্ড ও ত্রিলোচন। ঐ মুখের শুণ্ডাদণ্ড মনোজ্ঞ এবং পুষ্কর ও মোদকান্বিত। তাঁহার অন্য মুখ পীতবর্ণ এবং অন্যান্য মুখ যথাক্রমে নীল, পিঙ্গল ও শুভ্রবর্ণ। এই সকল মুখই শুভ লক্ষণান্বিত। তাঁহার দশভুজে পাশ, পরশু, পদ্ম, অঙ্কুশ, দন্ত, অক্ষমালা, লাঙ্গল, মুষল, বরদ ও মোদকপূর্ণ পাত্র আছে। এইরূপেই তাঁহাকে চিন্তা করিতে হয়। তিনি লম্বোদর, বিরূপাক্ষ, মেখলান্বিত, যোগাসনে উপবিষ্ট ও মস্তকে চন্দ্রলেখাধর। তাঁহার সাত্ত্বিক ধ্যান নরগণকে এইরূপেই করিতে হয়। তদীয় রাজস ধ্যান নিম্নোক্তরূপে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি বিশুদ্ধ সুবর্ণসন্নিভ, গজবক্ত্র, অলৌকিক রূপসম্পন্ন, চতুর্ভুজ, ত্রিনয়ন, একদন্ত, মহোদর, পাশাঙ্কুশধারী এবং দন্তে তাঁহার মোদক-পাত্র। তাঁহার তামসধ্যান নীলবর্ণ। এইরূপে গুণভেদে তাঁহার



গজলক্ষ্মী



পদ্মাখ দেবতা



শীল



নৃত্তরত গণেশ



গণেশ

ত্রিবিধ ধ্যান উক্ত হইয়াছে। এইরূপ ধ্যানের পর তাঁহার পূজা করিবার বিধি আছে। প্রথমে একবিংশতি গাছ দূর্বা লইয়া তাহার দুই দুই গাছি দূর্বা গণেশের বিভিন্ন দুই দুইটি নাম যথারীতি উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে অর্পণ করিতে হয়। পরে সকল নাম উল্লেখ করিয়া অবশিষ্ট একগাছি দূর্বা প্রদান করিতে হয়। এইরূপ গণেশ নাম উচ্চারণ করিয়া একবিংশতিতে মোদক দানও করিবার নিয়ম আছে। গণপতিপূজার পৃথক্ পৃথক্ দশ নাম এইরূপ কীর্তন করিতে হয়; যথা—হে গণধিপ, উমাপুত্র, অঘনাশন, বিনায়ক, ঈশপুত্র, সর্বসিদ্ধি-প্রদায়ক, একদন্ত, ইভবক্ত্র ও মূষিকবাহন, তোমাকে নমস্কার। তুমি কুমার গুরু, তুমি সর্বত্র সযত্নে পূজনীয়

চীনদেশে গণেশ

চীনদেশেও গণেশ-পূজা হইয়া থাকে। কিন্তু কতদিন পূর্বে চীনদেশে গণেশপূজা প্রবর্তিত হয় তাহা নিরূপণ করা যায় না। ভারতবর্ষ হইতেই ইহা চীনদেশে গিয়াছে, তবে কোন্ পথ দিয়া গিয়াছে তাহা নিশ্চয় করিয়া জানিতে পারা যায় নাই।

দুইটী পথ দিয়া চীনদেশে গণেশ-পূজার প্রবেশ-লাভের সম্ভাবনা দেখা যায়। প্রথমটি হইতেছে চীন-তুর্কস্থানের মধ্যবর্তী স্থলপথ দিয়া অথবা নেপাল এবং তিব্বতের মধ্য দিয়া। এই পথ দিয়াই বোধ হয় সর্বপ্রথম চীনে গণেশ-পূজার সূচনা হয়। গণেশের পূজা হয়তো ভারতীয় পণ্ডিতগণ[1] চীনদেশে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, অথবা চীনদেশীয় বৌদ্ধ সন্ন্যাসীগণ ভারতে তীর্থভ্রমণ করিয়া ফিরিবার পথে বর্তমান চীন দেশে প্রচলিত রহস্যময়

* চীনদেশের গণেশ সম্বন্ধে বহু উপাদান অ্যালিস গেটি সংগ্রহ করিয়া তাঁহার পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বর্তমান নিবন্ধের অধিকাংশ উপকরণ তাঁহার সুদুর্লভ বিবরণ ব্যতীত পাইবার উপায় ছিল না। কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাঁহার নিকট ঋণ স্বীকার করিতেছি।

1. V. P. 73.

গণেশ-পূজার উপযোগী যোগাচার অথবা তান্ত্রিক-বিদ্যা এদেশ হইতে লইয়া গিয়াছিলেন। দ্বিতীয় পথটী সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ভারত হইতে সমুদ্রপথে চীনদেশে যাতায়াত করিতেন এরূপ বিবরণ যথেষ্ট পাওয়া যায়। তাঁহারাই তন্ত্রশাস্ত্র ও তন্ত্রাচার এবং বজ্রধাতু ও গর্ভধাতু নামক মহাযান সাধনার দুইটী মণ্ডল—সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য রহস্যচিত্রমূলক মণ্ডল চীনদেশে প্রবর্ত্তন করেন; এই রহস্যচিত্রাবলীর মধ্যে গণেশেরও স্থান ছিল।

চীন ও জাপান দেশে দুই প্রকারের গণেশ দেখিতে পাওয়া যায়; বিনায়ক এবং কুয়ন-শি-তিয়েন্ বা কঙ্গি-তেন্। বিনায়কের মূর্তি একক। তাহার সঙ্গে আর কিছু থাকিত না। সমস্ত বৌদ্ধ প্রধান দেশে যেরূপ গণেশ দেখা যায় এই গণেশও তদনুরূপ। এই গণেশ হস্তি-মুণ্ড ও দ্বি-বাহুযুক্ত এবং ব্যত্যস্তপাদ (অর্থাৎ পায়ের উপর পা রাখিয়া উপবিষ্ট)। কঙ্গি-তেন যুগ্ম-গণেশ। চীন ও জাপান ব্যতীত অন্য কোন দেশেই এরূপ মূর্তি দেখা যায় না। পরস্পর সংগ্রথিত দুইটী হস্তি-মুণ্ড দেবতার দণ্ডায়মানা মূর্তি দ্বিতীয় প্রকার গণেশের প্রতীক বলিয়া গৃহীত।

চীনদেশে গণেশের প্রাচীন প্রতীকের মাত্র দুইটী মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। একটি মুর্তি তুন্-হুয়ঙের গুহা-মন্দিরের প্রাচীরে অঙ্কিত। কুঙ্-সি-এন্ নামক স্থানে পাহাড় কাটিয়া একটী মন্দির নির্মাণ করা হইয়াছে। অপরটী এই মন্দিরের প্রস্তর মূর্তি। ইহা প্রকৃতপক্ষে অল্পমাত্র উদ্গত ভাস্কর্য (base relief)। Paul Pelliot-র মতে দেওয়ালে অঙ্কিত গণেশগুলি ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমভাগে অঙ্কিত হইয়াছিল। এইগুলি কুঙ্-সিয়েনের প্রস্তর ভাস্কর্যের সমসাময়িক Rene Grousset-এর মতে তুন্-হুয়ঙের দেওয়ালে অঙ্কিত ছবি গুলির মধ্যে গান্ধার, গুপ্ত এবং ইরানীয়া ছাঁচ বেশ সুস্পষ্ট[1]; সুতরাং

1. H de e'E O tome 1 p. 316.

আমাদের দেখিতে হইবে যে এইগুলি চীনদেশীয় বৌদ্ধগণ কর্তৃক অথবা ভারতীয় চিত্রকরগণ অথবা উভয়ের দ্বারাই অঙ্কিত হইয়াছিল কিনা।

এই সময়েই অজন্টার নিখুঁত চিত্রাদি অঙ্কিত হইতেছিল। যে সমস্ত বৌদ্ধ চীনদেশ হইতে ভারতে এই সময়ে তীর্থ-ভ্রমণে আসিয়াছিলেন বিখ্যাত ভ্রমণকারী য়ুয়ান্-চোয়াঙের মত কয়েকজন চিত্রশিল্পীও যে তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন তাহা নিঃসন্দেহ। ইহারা অজন্টায় আসিয়াছিলেন; এবং তুন্-হুয়ঙ্ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। অজণ্টার প্রাচীর-গাত্রাঙ্কিত চিত্রগুলির ক্রমোন্নতি চরোমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছে তুন্-হুয়ঙের ১নং গুহাচিত্রগুলির মধ্যে। এই চিত্রগুলি যে খুব দক্ষ শিল্পিগণ কর্তৃক অঙ্কিত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তবে এই সমস্ত চিত্রের মধ্যে মৌলিকত্ব বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। এইগুলি দেখিয়া মনে হয় যে এগুলি হিন্দু চিত্রকলার নকল। অবশ্য এই জাতীয় হিন্দুচিত্র বর্তমানে সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইয়াছে।

ওয়াই (Wei) রাজবংশীয়গণের বৌদ্ধ মূর্তিগুলির উপরে এবং উভয়পার্শ্বে হিন্দুদেবতাগণের যে চিত্র প্রাচীর-গাত্রাঙ্কিত আছে' তাহাদের মধ্যে অশ্বচালিত রথে সূর্য, হংসচালিত রথে চন্দ্র, এবং একটী কপোতের (frieze) মধ্যে নবগ্রহকে দেখা যায়। বৌদ্ধমূর্তির নীচে কামদেব। কামদেবের পার্শ্বে এবং একটু নিম্নদেশে মহারাজলীল ভঙ্গিতে উপবিষ্ট গণেশের চিত্র অঙ্কিত। এইরূপ চিত্র বিশেষভাবে ১২০ নং N গুহায় দেখা যায়।

গণেশের এই চিত্রগুলি যত্নের সহিত নিরীক্ষণ করিয়া গণেশের অন্যান্য প্রতিকৃতিগুলিকে পরীক্ষা করিলে বেশ বুঝা যায় যে ওয়াইবংশীয় রাজগণের পরবর্তী যুগে এই প্রতিকৃতির অভ্যুদয়। তুন্-হুয়ঙের বিনায়ক-প্রতিকৃতি সম্বন্ধে এই উক্তি বিশেষভাবে খাটে।

চীন-তুর্কস্থানের এনদেয়ারে (Enderet) নামক স্থানে একটি প্যানেলের (panel) উপর একটী বিনায়ক গণেশের চিত্র দেখা যায়। ইহা অষ্টম শতাব্দীর। এই চিত্রটীর সহিত তুন্-হুয়ঙের বিনায়ক প্রতিকৃতির যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়। উভয় চিত্রের মাথায় তিন ভাগ চিত্রিত হইয়াছে। চক্ষুর্দ্বয় ও নাসিকাদণ্ডের যে স্থান হইতে শুণ্ড উত্থিত হইয়াছে শিল্প-চাতুর্য উভয় ক্ষেত্রেই এমনই সাদৃশ্যপূর্ণ যে হয় একই ব্যক্তি কর্তৃক উহারা অঙ্কিত, নতুবা একই সম্প্রদায়ের চিত্রকর কর্তৃক অঙ্কিত হইয়াছে। তুন্-হুয়ঙের গণেশ কক্ষের লম্বা, সরু, শ্বেত শুণ্ডটী বাম হস্তে যে ভাবে ধরিয়া আছেন এনদেয়ারের গণেশও ঠিক সেইভাবে একটী সরু লম্বা মূলা ধরিয়া আছেন। মাথার পাগড়ীতে ইরানীয় প্রভাব বিদ্যমান। পাগড়ীটী সম্মুখের দিকে টানিয়া উভয় গণেশের কপালের উপর বাঁধা হইয়াছে। ইহা চীন-তুর্কস্থানের দন্দান-উইলিগের (Dandan-Uilig) বিখ্যাত অঙ্কিত বজ্রপানি চিত্রের পাগড়ীর অনুরূপ। এনদেয়ারের গণেশের পায়জামা পারস্যবাসীদের ন্যায় টানা করিয়া বাঁধা। তুন্-হুয়ঙের গণেশের পায়জামা এইভাবে নাই। তাহা মধ্যএশিয়ার পায়জামার অনুরূপ। তুন্-হুয়ঙের শুঁড়টী দক্ষিণে ফেরান আর এনডেয়ারে বামে ফেরান ; কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই একই ভাবে অঙ্কিত। প্রথমে শুঁড়ের অর্ধেক পর্যন্ত লম্বভাবে ঝুলান এবং পরে পার্শ্বে ফেরান ও উত্তরদিকে স্কন্ধ পর্যন্ত প্রথমার্ধের সহিত সমান্তরালভাবে টানা। তুন-হুয়ঙের চিত্রে দক্ষিণ হস্তটী স্কন্ধের সহিত এক সমরেখায় অবস্থিত। এই হস্ত হইতে শুঁড়টী একটী পিষ্টক লইতে উদ্যত। বাম-হস্ত ও শুঁড়ের ভঙ্গিটী বক্ষের নিকট একটু স্বতন্ত্র রকমের। এপর্যন্ত এইরূপ ভঙ্গি আর কোথাও দেখা যায় নাই।

তুন-হুয়েঙর প্রাচীন-চিত্র এবং কুঙ্-সিয়েনের ভাস্কর্য দেখিয়া মনে হয় যে এগুলি সমসাময়িক। অবশ্য একই কারণে ইহাদের

উৎপত্তি হয় নাই। কুঙ-সিয়েনের বৌদ্ধ গুহামন্দিরের অল্পমাত্র উদ্গত ভাস্করমূর্তিটীই ভারত ও চীনদেশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন গণেশের মূর্তি, একখানি শিলালিপি হইতে জানা যায় যে ৫৩১ খ্রীস্টাব্দে ইহার উৎপত্তি। মূর্তিটী ব্যত্যস্ত-পাদ। দক্ষিণ হস্তটী উর্ধে উত্তোলিত হইয়া একটী পদ্ম ধরিয়া আছে এবং বাম হস্তটী একটী চিন্তামণি ধরিয়া ক্রোড়ের উপর ন্যস্ত। শিলালিপিতে ইহাকে 'হস্তি-প্রেতাধিদেব' বলা হইয়াছে। ইহার সহিত অন্যান্য নয়টী নিকৃষ্টতর 'প্রেতাধিদেব' রহিয়াছে। ঠিক এই দলটীর প্রতীক ৫৪৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত একটী বৌদ্ধ স্মৃতি-ফলকের নীচে রহিয়াছে।[1] এই স্মৃতিফলকটী পূর্বে M. Victor Goloubew-র অধিকারে ছিল। বর্তমানে ইহা Boston-এ রক্ষিত আছে।

ভারতবর্ষে সাধারণতঃ নবগ্রহ ও সপ্তমাতৃকের মধ্যে গণেশের মূর্তি দেখা যায়। কিন্তু চীনদেশে অন্যান্য নয়টী দেবতার (প্রেতাধিদেবের) সহিত তাঁহাকে দেখা যায়। ভারতবর্ষে এই প্রেতাধিদেবগণের মধ্যে গণেশকে কখনও দেখা যায় না। এই দেবতাগণ নাগ, বায়ু, মুক্তা, অগ্নি, বৃক্ষ, পর্বত মৎস্য, সিংহ, পক্ষী এবং হস্তি-প্রতীক প্রেতাধিদেব। ইহাদের মধ্যে সিংহ, পক্ষী এবং হস্তীর প্রাধান্য চীনদেশীয় বৌদ্ধধর্মে অঙ্গীকৃত হইয়াছে। সিংহ এবং হস্তীর বিশেষ প্রাধান্য। সিংহ সমন্তভদ্রের এবং হস্তী জ্ঞানের দেবতা মঞ্জুশ্রীর বাহন।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে অথবা ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমভাগে ভারতবর্ষ হইতে একটী গণেশের ক্ষুদ্র প্রতিমূর্তি চীনদেশে আনা হইয়াছিল। কুঙ্-সিয়েনের মূর্তি তাহা হইতেই উদ্ভুত এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সে দেশে চীনদেশে হস্তী একেবারে ছিল না বলিলেই হয়, সুতরাং চীন ভাস্করের পক্ষে তখন হিন্দু-

1. V. Ars Asiatica, vo,l. II. p.15

ধারণার অনুরূপ গণেশকে মৌলিকভাবে নির্মাণ একরূপ অসম্ভব ছিল।

চীনাদের মধ্যে তাহাদের দেবদেবীর প্রতিমূর্তি পূজা করিবার প্রথা ছিল না। সম্ভবতঃ চীনদেশ হইতে আগত তীর্থযাত্রীরা ভারত হইতে এই পূজা-পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ গণেশের মূর্তিপূজা তাহাদের পক্ষে গ্রহণ করা স্বাভাবিক ছিল, কারণ হস্তিমূর্তিটীকে তাঁহারা বুদ্ধ ধারণার প্রতীক বলিয়া মনে করিতেন।

এইজন্যই মনে হয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমে ফা-হিয়েন ভারত হইতে প্রত্যাগমনকালে গণেশের একটি প্রতিমূর্তি লইয়া গিয়াছিলেন। এমনও হইতে পারে যে যশোগুপ্ত, বুদ্ধনন্দি এবং অন্যান্য তিনজন বৌদ্ধ ৪৬০ খ্রীস্টাব্দে সিংহল হইতে ভারতের মধ্য দিয়া এবং কোন কোন বিবরণে তিব্বত[১] হইয়া যাত্রার পূর্বে অন্যান্য মূর্তির সহিত বিঘ্ননাশন গণেশেরও একটী মূর্তি তাঁহাদের সহিত লইয়া গিয়াছিলেন। চীন সম্রাজ্ঞী হু (Hou) গোঁড়া বৌদ্ধ ছিলেন।

গণেশ পূজা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই যে তাঁহার মূর্তি ভারত হইতে চীনদেশে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল এমন সম্ভাবনা সে সময়ে ছিল না* বলিলেই হয়। বস্তুত সপ্তম শতাব্দীর শেষার্ধে য়ুয়ান-চোয়াঙের সময়েও গণেশ পূজার প্রচলন চীনদেশে হয় নাই, কারণ, য়ুয়ান-চোয়াঙতুন-হুয়াঙ্[২] হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেও তিনি তাঁহার ভারতভ্রমণ-বিবরণে গণেশের উল্লেখ পর্যন্ত করেন নাই। তাঁহার জাপান দেশীয় শিষ্য দাশোও গণেশ-পূজা জাপানে প্রতিষ্ঠিত করেন নাই—তিনি সেখানে যোগ-ধর্ম প্রবর্তিত করেন।

1. Ars Asiatica, Vol ii, V. Prs XXVII and XXXVI 2. Chinese Buddhism, Edkins, p.111, wei shou on Buddhism, James Ware, P. 148

সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে আর একজন চীনদেশীয় বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ই-চিঙ, প্রায় সমস্ত ভারত ভ্রমণ করিয়া চীনদেশে প্রত্যাগমন করেন। তিনিও য়ুয়ান-চোয়াঙের মত গণেশ অথবা গণেশ-পূজার বিষয়ে কোন কিছুই তাঁহার ভ্রমণ-বিবরণে লিপিবদ্ধ করেন; নাই অবশ্য তিনি ভারতে এবং মালয় উপদ্বীপে কয়েক বর্ষ বাস করিয়াছিলেন এবং সেইজন্যই গণেশ এবং তাঁহার জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে বিশেষ তথ্য অবগত হইয়াছিলেন। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে ই-চিঙ কর্তৃকও চীনদেশে গণেশ পূজা প্রবর্তিত হয় নাই। আরও অনেক ভ্রমণকারী য়ুয়ান-চোয়াঙের পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে য়ুয়েন-চাও নামক একজন ভ্রমণকারী যুগ্ম গণেশমূর্তি ও তাঁহার রহস্যপূর্ণ পূজাপদ্ধতি প্রবর্তন করেন বলিয়া মনে হয়। ইনি ৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতাভিমুখে চীনদেশ হইতে যাত্রা করেন। তখনকার চীনদেশীয় রাজকন্যা ওয়ে-চঙের সহায়তায় তিনি তিব্বতের মধ্য দিয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন। তিনি নালন্দা বিহারে বহুবৎসর অবস্থান করেন।

নালন্দা বিহারে য়ুয়ান্ চাও ভারতীয় তন্ত্রশাস্ত্র শিক্ষা করেন। নালন্দা তখন বৌদ্ধ প্রভাবাধীন ছিল বটে, কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতিগত শিক্ষার মধ্য দিয়া তাঁহার যথেষ্ট সুবিধাই হইয়াছিল। চতুর্থ শতকের মধ্যেই তন্ত্রযান ও উহার মন্ত্র, ধারণী ও মণ্ডলগুলি বৌদ্ধতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ইহা হইতেই বৌদ্ধ 'গুহ্যসমাজ' রচিত হইয়াছিল। গুহ্যসমাজতন্ত্রেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, বুদ্ধদেব স্বয়ং তাঁহার শিষ্যদিগকে অতি গুহ্য মন্ত্র 'গণপতি-হৃদয়' শিক্ষা দিয়াছিলেন। উক্ত 'গুহ্যসমাজতন্ত্র' য়ুয়ন্-চাও নিশ্চয়ই শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইহারই ফলে গণেশ-সংস্কৃতির প্রতি তাঁহার আসক্তি জন্মে।

সপ্তম শতাব্দীতেই আর একটী 'যোগাচার' তান্ত্রিক মতের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। ইহাতে 'সমাধি'র সাধনায় যোগাভ্যাসের

অর্থাৎ 'বৈরোচন' প্রাপ্তির পন্থা প্রচলিত হয়। তন্ত্র হইতেই বৌদ্ধ দেবদেবীর আবির্ভাব হয় এবং উহার দার্শনিক পরিকল্পনা হইতেই পঞ্চ ধ্যানী বুদ্ধের উদ্ভব হইয়াছিল। এই বৌদ্ধ দেব-গোষ্ঠীর মধ্যে অনেক হিন্দু দেবতাও অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়েন, তন্মধ্যে গণেশ অন্যতম।

যোগাচার ও উহার গুহ্যমত ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে বিশেষ প্রসারলাভ করিতে পারে নাই বা উহার কোন বিশেষ পরিবর্তন হয় নাই, যোগ বা বৈরোচনের সহিত সংযোগ জ্ঞানীদের মধ্যে কেন্দ্রীভূত ছিল। ক্রমশঃ বৌদ্ধ সাহিত্যে হিন্দুতন্ত্রের প্রবেশলাভ ঘটিলে যোগসাধনায় শক্তিপূজার আবির্ভাব হয়। ফলে 'গুহ্যসমাজে' শক্তি-সংস্কৃতির যথেষ্ট প্রভাব আসিয়া পড়িয়াছে এবং উহার মণ্ডলে পঞ্চ ধ্যানী বুদ্ধের প্রত্যেকের সহিত নিজ নিজ শক্তিকে দেখা যায়। এখানে হিন্দু আদর্শানুযায়ী শক্তি স্ত্রীদেবতারূপেই পরিকল্পিত হইয়াছেন। মূল দেবতার সহিত শক্তির পরিকল্পনা অপেক্ষাকৃত ছোট করা হয়। বৌদ্ধ তন্ত্রেও এই আদর্শ রক্ষিত হইয়াছে। হিন্দুতন্ত্রের সমবধারণা বৌদ্ধ তন্ত্রে গৃহীত হইবার সময় যে কয় জন হিন্দু দেবদেবী বৌদ্ধ দেবগোষ্ঠীর মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে গণেশ অন্যতম, একথা পূর্বেও বলা হইয়াছে। অবশ্য গণেশ মহাযান শাখার অন্তর্ভুক্ত হন নাই। বৌদ্ধতন্ত্রে গণেশের শক্তি তাঁহার বাম জানুর উপর উপবিষ্টা।

সপ্তম শতকের প্রথম ভাগে তিব্বতরাজ স্রং-সম্-গম্-পো বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। চীনা রাজকুমারী ওয়েন্ সে'ও ছিলেন বৌদ্ধ। এ-ছাড়া এক জন নেপালী বৌদ্ধ রাজকুমারীও মহিষী ছিলেন। সম্ভবতঃ ইঁহাদের দ্বারাই স্রং-সম্-গম্-পো বৌদ্ধ হন। সপ্তম শতকের তৃতীয় পাদে ভারতের পথে সুয়ন্-চাও তিব্বতে উপস্থিত হইবার একাদশ বর্ষ পূর্বে অর্থাৎ প্রায় ৬২৯ খ্রীস্টাব্দে তিব্বতরাজ বৌদ্ধ শাস্ত্রাদি সংগ্রহ করিয়া আনিবার জন্য তো'ন্-মি

সম্ভোটকে ভারতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ গ্রন্থাদি লইয়া যাইবার সময় তো'ন্-মি সম্ভোট শক্তি-পূজা-সম্বলিত বহু তন্ত্রগ্রন্থও লইয়া যান। ইহাতেই তিব্বতে প্রথম তন্ত্রের প্রবেশলাভ ঘটে। নেপাল হইতে হিমালয়-গিরিবর্ত্মের মধ্য দিয়াই যে তিব্বতে তন্ত্রকে লইয়া যাওয়া হয় তাহার প্রমাণও আমরা পাইয়া থাকি। * সপ্তম শতকের মধ্যভাগে যুয়ন্-চাঙ যখন নালন্দায় আসেন তখন তিনি নিশ্চয়ই ভারতে শক্তি-সংস্কৃতির প্রভাব লক্ষ্য করিয়াছিলেন, এমন কি প্রত্যাবর্তনের সময় নেপাল ও তিব্বতে গিয়া তিনি ভারতীয় ও তিব্বতীয় যোগাচারের বৈশিষ্ট্য ও পরস্পারের পার্থক্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

মধ্যযুগে তিব্বতে বোন্-পো ধর্মের প্রচলন ছিল। অনেকের মতে, এই বোন্-পো ধর্মের সহিত সভ্যতার সংস্রব ছিল না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা একটী তান্ত্রিক ধর্মমত। সুতরাং যোগাচার মত অপেক্ষা শক্তিপূজার প্রভাব তিব্বতীয়দের মধ্যে অধিকতর বিস্তৃত ছিল বলিয়াই মনে হয়। তিব্বতীয় 'যব-যুম' মূর্তি হইতে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। যোগাচারিগণ-কর্তৃক গণেশ বৌদ্ধ দেবতারূপে তিব্বতে প্রচারিত হইবার পর হইতে যব-যুম মূর্তির বৈশিষ্ট্য বৃদ্ধি পায়। হিন্দুর অন্য কোন দেবতাকে শক্তির সমভিব্যাহারে তিব্বতীয়গণ গ্রহণ করে নাই, এক্ষেত্রে শক্তি-সহ গণেশকে মাত্র গ্রহণ করিবার মূলে কোন কারণ থাকাই সম্ভব। অবশ্য যব-যুম মূর্তিতে গণেশের পরিকল্পনার কোন নিদর্শন আমরা পাই না। যুব-যুম মূর্তি তিব্বতীয় পরিকল্পনা। তিব্বতীয় যব-যুম মূর্তিতে কোথাও কোথাও শক্তিসহ হস্তিমুণ্ডবিশিষ্ট দেবতাকে দেখা গিয়াছে। এইরূপ মূর্তি যে গণেশেরই মূর্তি তাহা অনায়াসেই মনে করা যাইতে পারে। তিব্বতের যব-ধুম মূর্তির মত গুহ্য তান্ত্রিক দেবদেবীর মিলিত মূর্তির পরিকল্পনা চীন ও জাপানে অজ্ঞাত ছিল—ভাস্কর্যে বা চিত্রকলায় তাহার কোনও নিদর্শনও পাওয়া

* B. Bhattacharya : Buddhist Esoterism, 50.

যায় না। কিন্তু অন্যভাবে এই মিলনের আদর্শ চীন-জাপানে প্রবেশ করিয়াছে। সেখানে পুরুষ ও স্ত্রী দেবতার পরিবর্তে দুইটী গণেশ-মূর্তিকে মিলিত ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। তিব্বত, মঙ্গোলিয়া ও নেপালে প্রথমতঃ তান্ত্রিক দেবতার প্রচলন ছিল। সেক্ষেত্রে চীন বা জাপানে যুগ্ম-দেবতার পরিকল্পনার আদর্শ নিশ্চয়ই উক্ত তিনটী দেশ হইতে আসিয়াছিল এরূপ বিশ্বাস করা যায়। চীনে এই যুগ্ম-দেবতার নাম—কুয়ন্-সি-তি'এন্, জাপানী নাম—কঙ্গি-তেন। সুয়ন-চাও চীনে কুয়ন্-সি-তি'এন্ মূর্তির প্রবর্তক। ইনি এক জন রহস্যবাদী ও সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। ভারতের আগমনের পূর্বেও চীনে রহস্যবাদিরূপে ইহার বেশ প্রতিষ্ঠা ছিল। ইহার গুরু-ফা-সুন্-এর ধর্মমত ছিল—ফা-সিঙ-সুঙ, অর্থাৎ প্রকৃতিবাদ। ভারতে আসিয়া সুয়ন্-চাও নালন্দার আচার্য রত্নসিংহের নিকট হইতে তন্ত্রসাধনায় শিক্ষালাভ করিয়া যোগের সপ্তদশ সিদ্ধি লাভ করেন। ফিরিবার পথে তিব্বত-সীমান্ত দিয়া তিনি নেপালে আসেন। নেপালে তিনি যথেষ্ট সমাদৃত হন। অতঃপর তিব্বতের মধ্য দিয়া যাইবার সময় তিব্বতের শাসনকর্ত্রী ওয়েন্-সে'ঙ তাঁহাকে খুব আদর-অভ্যর্থনা করেন ও বহু উপহার-উপঢৌকন দেন। এই উপহারসমূহের মধ্যে নিশ্চয়ই যব-যুম মূর্তিতে গণেশের একটী মূর্তি ও উহার সহিত গণেশ-পূজার তান্ত্রিক গ্রন্থাদিও ছিল। ওয়েন্-সেঙ গণেশের ভক্ত ছিলেন এবং তিনি গণেশের জন্য তিব্বতে একটী মন্দিরও করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি যে সুয়ন্-চাওকে গণেশের মূর্তি দিবেন না, তাহা স্বীকার করা যায় না।

এখন দেখা যাইতেছে, সুয়ন্-চাওই চীনের গণেশ-মূর্তি ও তন্ত্রসম্মত গণেশ-পূজার প্রবর্তক। ৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে সুয়ন্-চাও চীনে দেশে ফিরিয়া লো-য়াঙএ উপস্থিত হন। এখানে চীন-সম্রাট্ কাও-সুঙ তাঁহার প্রিয়তমা উপপত্নী উ-সে-তি'এয়েনের হাতে রাজ্যশাসনভার ছাড়িয়া দিয়া অবস্থান করিতেছিলেন। অবশ্য কাও-সুঙ বৌদ্ধ-

ধর্মাবলম্বী ও একজন পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। য়ুয়ন্-চোয়ঙের একটী বৌদ্ধ অনুবাদগ্রন্থের ভূমিকা তিনিই রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। তিনিই স্যুয়ন্-চাওকে প্রথম ৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে আদর-অভ্যর্থনা করেন। স্যুয়ন্ চাওএর নিকট হইতে তিনি নিশ্চয়ই তাঁহার (স্যুয়ন্-চাওয়ের) ভ্রমণের তান্ত্রিক অভিজ্ঞতা এবং যুগ্মমূর্তি গণেশ-পূজার সার্থকতা ও গণেশের তান্ত্রিক পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য শুনিয়াছিলেন। অবশ্য কাও-স্যুঙ স্যুয়ন-চাওএর নিকট হইতে গণেশ-পূজার তান্ত্রিক মতবাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন কি না তাহার কোন প্রমাণ নাই। সম্রাজ্ঞী উ-সে-তি'এয়েনেরও ইহাতে আন্তরিকতা ছিল কি না তাহাও জানা যায় না। কিন্তু একটা প্রচেষ্টা আরও কিছুকাল ধরিয়া চলিয়াছিল। কারণ ৭০৫ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাজ্ঞী উ-সে-তি'এয়েনের পুত্র চুঙ-স্যুঙ সিংহাসনারোহণ করিলে তদীয় মহিষী উই স্বামীকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করিয়া সিংহাসনারোহণ-পূর্বক তান্ত্রিক গণেশ-সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠায় ও প্রচলনে আনুকুল্য প্রদর্শন করেন। এক্ষেত্রে স্বতঃই অনুমিত হয় যে, সম্রাট্ কাও-স্যুঙের ইচ্ছা থাকিলেও তদীয় উপপত্নী উ-সে-তি'এনের দ্বারা গণেশ-সংস্কৃতির প্রচার সম্ভবপর হয় নাই। উ-সে-তি'এন্ অতঃপর ৬৮৪ হইতে ৭০৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সম্রাজ্ঞীরূপে রাজ্য করেন। তখনও এই গণেশ-সংস্কৃতির প্রবর্তন সম্ভবপর হয় নাই। উ-সে-তি'এন্এর পুত্র চুঙ-স্যুঙেরও সম্ভবতঃ ইহার অনুকূলে মত ছিল না। শেষে সম্রাজ্ঞী উই উহার প্রবর্তনে সহায়তা করিলেন। এইভাবে সপ্তম শতকের শেষে বা অষ্টম শতকের প্রথমে চীনে তা'ঙ রাজবংশের সহায়তায় তান্ত্রিক গণেশ পূজার প্রথম প্রবর্তন হয়।

গণেশ সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা করিতে স্যুয়ন্-চাওএর প্রায় এক বৎসর লাগিয়াছিল, কারণ ৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাটের আদেশে তাঁহাকে লোকায়ত নামক ব্রাহ্মণকে লো-য়াঙ-এ আনিবার জন্য কাশ্মীরে যাইতে হইয়াছিল। লোকায়ত একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহাকে চীনদেশে আনাইয়া বৌদ্ধ সংস্কৃত যোগশাস্ত্র চীনাভাষায়

রূপান্তরিত করিয়া চিঙ-আই-স্থ-র সন্নাসিগণের বোধের অনুকূল করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করা হয়। কিন্তু চীনা ভাষা না জানায় বা উহা আয়ত্তে আনা সম্ভবপর না হওয়ায় তিনি তাহাতে অসমর্থ হন। তখন তিনি তাঁহার সঙ্গে আনীত সংস্কৃত গ্রন্থাদি চিঙ-আই-স্থ-র মন্দিরে রাখিয়া কাশ্মীরে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি যখন চীনে আসেন তখন তাঁহার সহিত স্থয়ন-চাওকে প্রত্যাগমন করিতে দেখা যায় নাই কারণ কাশ্মীরের পথেই ভারতে তাঁহার দেহাবসান ঘটে।

সপ্তম শতকে চীনে গণেশ-যোগ ও গণেশের তান্ত্রিক সংস্কৃতি প্রচলিত ছিল কিনা এ বিষয়ে প্রশ্ন উঠিতে পারে। ইহার বিশেষ প্রমাণ না পাওয়া গেলেও একথা স্থির করা যাইতে পারে যে, সপ্তম শতকের শেষেই চীনের গণেশ-সংস্কৃতির প্রবেশ-লাভ ঘটিয়াছিল। চীনা গ্রন্থ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, অষ্টম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে চীনদেশে গণেশ যুগ্মমূর্তিতে পূজিত হইতেন। যদি ধরা যায় স্থশন-চাঙ-কর্তৃক চীনে কুয়ন-সি-তি'এনের পূজা প্রবর্তিত হয় নাই, তাহা হইলে শুভাকরসিংহ নামক ভারতীয় পণ্ডিতকে ইহার প্রবর্তক অথবা চীনা ভাষায় বৌদ্ধ গ্রন্থাদির প্রথম অনুবাদকরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। শুভাকর (৬৩৭—৭৩৫) ছিলেন উড়িষ্যার জনৈক নৃপতি। পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনারহনের অব্যবহিত পরে তিনি স্বীয় ভ্রাতার হস্তে রাজ্যভার দিয়া প্রব্রজিত জীবন গ্রহণ করেন। তিনি ধর্ম-গুপ্তের নিকট যোগ ও তন্ত্র শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন এবং ধর্ম-গুপ্তেরই নির্দেশানুসারে চীনে গিয়া যোগাচার মতের প্রচার করেন। পরিব্রাজক জীবনের কোন বিবরণ শুভাকর লিখিয়া যান নাই। তবে অষ্টম শতকের প্রথমদিকে যে তিনি চীনে ছিলেন তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। প্রাপ্ত পুথি-পত্রাদি হইতে জানা যায় যে, ৭১৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারতবর্ষ হইতে চীনের পথে যাত্রা করেন। সঙ্গে তিনি 'মহাবৈরোচন

ও বহু তন্ত্রগ্রন্থ লইয়া গিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ স্থলপথে না গিয়া তিনি জলপথে ভারতের পূর্ব উপকূলস্থ পালুর হইতে যাত্রা সুরু করেন। ৭১৬ খ্রীস্টাব্দে তিনি চীনে উপস্থিত হন। অতঃপর তিনি তাঙ সম্রাটদিগের রাজধানী চ'ঙ-আনে আসেন। এখানে সর্বশ্রেষ্ঠ তাঙ সম্রাট সুয়য়-সুঙ তাঁতাকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করেন। এইসময় শুভাকর আশী বৎসরে বৃদ্ধ। কিন্তু এই বৃদ্ধাবস্থাতেই তাঁহার যেরূপ কর্মশক্তি ছিল তাহা অতুলনীয়। এই সময়েই তিনি চীনা ভাষায় মহাবৈরোচনসূত্রের অনুবাদ করিয়াছিলেন। শেষ যে অনুবাদগ্রন্থ তিনি রচনা কারন তাঁহার জীবনের শেষ সময়ে লিখিত হইয়াছিল। ৯৮ বৎসরে ৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। শেষ জীবনে যে অনুবাদগ্রন্থটী রচিত হয় তাহা কুয়ন-সি-তি'-এন পূজার নিদর্শন-গ্রন্থরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে? এই তন্ত্র গ্রন্থটী শুভাকর ভারত হইতে আনিয়াছিলেন, বা চঙ্-আন্-এর বিহারগুলির একটীতে উহা রক্ষিত ছিল, বা লো-য়াঙএর চিঙ-আই-সুর মন্দিরে সুয়ন-চাও কর্তৃক পরিত্যক্ত গ্রন্থনিচয়ের উহা অন্যতম—কোনটীরই পক্ষে বিশেষভাবে কোন প্রামাণ্য উপস্থিত করা যায় না। তবে এত গ্রন্থ থাকিতে শুভাকর তাঁহার চীনে অবস্থানকালীন অল্প জীবনে অন্য কোন গ্রন্থের অনুবাদ না করিয়া এই গ্রন্থটীর অনুবাদ করিলেন কেন? এক্ষেত্রে উহা রাজ-অনুজ্ঞায় রচিত হইয়াছিল এরূপ মনে করা স্বাভাবিক। ইহাই যদি সত্য হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, শুভাকরের পূর্বেই চীনদেশে গণেশ-সংস্কৃতির প্রভাব আসিয়া পরিয়াছিল।

অষ্টম শতকের শেষভাগে যে কুয়ন-সি-তি'-এন পূজার প্রচলন ছিল তাহার প্রমাণও আমরা পাইয়াছি। চীনা সন্ন্যাসী চুঙ-সে লিখিত একটি গ্রন্থ হইতে জানিতে পারা যায় যে, অষ্ট শতকের শেষভাগে যে কুয়ন্-সি-তি'এন্ পূজার প্রচলন ছিল তাহার প্রমাণও

আমরা পাইয়াছি। চীনা সন্ন্যাসী চুঙ-সে লিখিত একটী গ্রন্থ হইতে জানিতে পারা যায় যে, প্রায় ৭৭৪ খ্রীস্টাব্দে হন্-কুয়াঙ নামক বৌদ্ধ বিক্ষু যুগ্ম-গণেশে বৈশিষ্ট্য এবং তাঁহার পূজাপদ্ধতি ও অনুষ্ঠানাদির ফল সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।

অষ্ট শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বিখ্যাত চীনা যোগী হুই-কুওর বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের বিষয় জানা যায়। তিনি সিংহল-দেশীয় পণ্ডিত অমোঘবজ্রের নিকট শিক্ষা ও দীক্ষা গ্রহণ করেন। দীক্ষা গ্রহণের পূর্বে যোগের দুই বিভাগের মণ্ডলে তিনি বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করেন। এই মণ্ডলের মধ্যে গণেশের স্থান আছে। চীনদেশে যে সমুদয় বৌদ্ধ ধর্মমত প্রচলিত ছিল, তিনি সেগুলি আয়ত্ত করিয়াছিলেন। সুতরাং চীনদেশে প্রচলিত কুয়ন-সি-তি'-এন্-র পূজাপদ্ধতি তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না, বিশেষতঃ যখন দেখা যাইতেছে যে, তাঁহারই শিষ্য কোবো দইসি জাপানে কুয়ন্-সি-তি'-এন্-পূজার প্রবর্তন করিয়াছিলেন। ইনি চীন দেশ হইতে জাপানে গিয়া তৎপ্রবর্তিত সিঙ্‌গন-সম্প্রদায়ের গূহ্য ধর্ম মতে এই কুয়ন্-সি-তি'-এন পূজার প্রচলন করিয়াছিলেন।

চীনদেশে যুগ্ম গণেশের মূর্তি পাওয়া গিয়াছে কি না জানা যায় না। তবে একাদশ শতকেও যে যুগ্ম-গণেশপূজার প্রচলন ছিল চীনা ও জাপানী গ্রন্থ সমূহ হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ১০১৭ খ্রীস্টাব্দে সম্রাট চেন-সুন্ 'ত্রিপিটকে' কুয়ন্-সি-তি'-এন্ পূজা সম্বন্ধীয় চারি খণ্ডে সম্পূর্ণ 'সূত্রের পুস্তকের সংযোজন নিষিদ্ধ করিয়া আদেশ জারি করিয়াছিলেন; অনুরূপ অন্যান্য গ্রন্থের চীনা ভাষায় অনুবাদও নিষিদ্ধ হইয়াছিল। সম্ভবতঃ কুয়ন্-সি-তি'-এন্ এর মূর্তি প্রস্তুত ও নিষিদ্ধ হয়। চীনে যুগ্ম-গণেশের কোন মূর্তি না পাওয়াই ইহার মুখ্য কারণ। কুঙ-সি-এন্ মন্দিরে ষষ্ঠ শতকের প্রথমার্ধের বিনায়কমূর্তি পাওয়া

গিয়াছে। ইহার পরে অষ্টম শতকের শেষভাগের অথবা নবম শতকের প্রারম্ভকালের যুগ্মমণ্ডলের কতকগুলি নক্সাচিত্র পাওয়া যায়।

অষ্টম শতকের অমোঘবজ্র চীনদেশে বৈরোচনের গুহ্যতত্ত্ব-সম্বন্ধে যে শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহা বজ্রধাতু ও গর্ভধাতু নামক যুগ্ম-মণ্ডলের ধর্মমতের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই যুগ্ম-মণ্ডলের তুইটী পরম বাস্তব দিক্ আছে—একটী বাহ্য দিক্ ও অপরটী গুহ্য দিক্। নক্সাগুলির বাহ্য ব্যাখ্যা-অনুযায়ী গর্ভধাতু এই বাস্তব ও পরিদৃশ্যমান জগতের প্রতীক এবং বজ্রধাতু আধ্যাত্মিক ও তাত্ত্বিক জগতের প্রতীক; যদিও তাঁহারা বাহ্যতঃ বিভিন্ন, প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা এক এবং অভিন্ন। তাঁহারাই ধর্মধাতু অথবা অখিল বিশ্বের প্রতীক।

গুহ্যতত্ত্বের দিক্ দিয়া ব্যাখ্যা করিলে বজ্রধাতু-নক্সার বৈরোচনই অখিল বিশ্বের আত্মা এবং গর্ভধাতুর কেন্দ্রে অঙ্কিত বজ্রসত্ব পরিদৃশ্যমান জগতে তাঁহারই প্রকাশ। এই প্রকাশেই অখিল বিশ্বের পরম সত্তা। নিগূঢ় নক্সাচিত্র তুইটী ব্রহ্মাণ্ডের এই তুইটী দিকের প্রতীক ইহাদের মধ্যে গুহ্যতত্ত্বটী শিক্ষার 'অভিষেক' হইবার পর জানিবার ইচ্ছা শিষ্যের হইত।

চীনদেশে গর্ভধাতুর মণ্ডর সম্ভবতঃ শুভাকরসিংহ প্রবর্তিত করেন, অন্তত মণ্ডলের প্রাচীনতম নক্সাটীর জন্য কৃতিত্ব তাঁহারই। গর্ভধাতুর মণ্ডলের প্রাচীনতম নক্সার দেবতাদের চিত্র অঙ্কিত নাই—তাঁহাদের নামগুলি মাত্র লেখা আছে। শুভাকর কোন বৌদ্ধগ্রন্থের সাহায্যে এই নক্সা করিয়াছিলেন তাহা জানা যায় না, তবে আট-পাপড়িযুক্ত পদ্মফুলের কেন্দ্রে বৈরোচনের (গুহ্যতত্ত্ববাদীদিগের মতে বজ্রসত্ব) নাম লেখা আছে। ইহা হইতে বলা যাইতে পারে যে, গুহ্য-পূজারহস্য-সংক্রান্ত গ্রন্থ হইতেই ভাব সংগ্রহ করিয়া ঐ নক্সার পরিকল্পনা করা হইয়াছিল।

শুভাকরসিংহের জীবিতাবস্থায়ই নক্সাটীর বহু পরিবর্তন সূচিত হয়। ক্রমে প্রাথমিক আকারে অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছিল এবং দেবতাদিগের নামের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছিল, যদিও 'মণ্ডলের' প্রত্যেক পরিবর্তিত নক্সাতেই 'ঈশান' (শিব) নামটী দেখা যায়, কিন্তু কোনটীতেই 'বিনায়ক' নামটীর উল্লেখ পাওয়া যায় না। জাপানের গর্ভধাতুর প্রাচীনতম নক্সাগুলির বহিরাবরণের 'ঈশান' হইতে তৃতীয় স্থানে 'বিনায়কের' মূর্তি রহিয়াছে। প্রবাদ, এইগুলির মধ্যে একটী মূল নক্সা এবং আর একটী নক্সা কোবো দইসি-কর্তৃক চীনদেশ হইতে আনীত মূল নক্সার অনুলিপি।

তোগনুর 'নন্দর নো কেন্‌ক্যুয় নামক গ্রন্থে দেখা যায় যে কোরিয়াদেশীয় যাজক চিসো দইজি অষ্টম শতকের শেষভাগে শুভাকরের নক্সার অনুলিপি প্রস্তুত করেন। পরে চিসো দইজি হুই-কুওর গুরু হইয়া শুভাকর যে বৌদ্ধ গ্রন্থগুলি সংস্কৃত হইতে চীনা ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন সেগুলি তাঁহাকে পাঠ করিতে দেন। চিসো যদি এই অনুলিপিটী হুই-কুওকে দেখাইয়া থাকে তাহা হইলে হুই-কুও নিশ্চয়ই তাহাতে বিনায়কের মূর্তি দেখেন নাই। এক্ষেত্রে গর্ভধাতু-মণ্ডলে কিভাবে বিনায়কের মূর্তি সন্নিবেশিত হইল সে রহস্য উদ্‌ঘাটন করা এক্ষেত্রে অসম্ভব।

বজ্র ধাতু-মণ্ডলটী বজ্রশেখর যোগ হইতে উদ্ভাবন করিয়া ভারতীয় সাধক নাগবোধি অঙ্কন করিয়াছিলেন। ৭৪৬ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার শিষ্য অমোঘবজ্রের চীনদেশে প্রত্যাগমনকালে তিনি তাঁহাকে ইহার অনুলিপি প্রদান করেন। নক্সাটীতে প্রত্যেক সারিতে তিনটী করিয়া তিন সারিতে নয়টী দেবতার চিত্র আছে। কেন্দ্র-পরিষদে পাঁচটী বৃত্ত, প্রত্যেক বৃত্তে পাঁচটী করিয়া দেবতার চিত্র অঙ্কিত। সমস্ত পরিষদটীর প্রচ্ছদপটে আরও অন্যান্য দেবতার চিত্র দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে গণেশের পাঁচটী বিভিন্ন আকারের চিত্র আছে।

তোগনুর মতে বজ্রধাতুর নক্সাটী ভারতবর্ষে প্রস্তুত হয় নাই। ইহার উদ্ভাবক অমোঘবজ্র। তিনি নাগবোধির নিকট মণ্ডল-অঙ্কন শিক্ষা করিয়া চীনদেশে উহা প্রস্তুত করেন। যাহাই হউক, একথা ঠিক যে, গর্ভধাতু বজ্রধাতুর মণ্ডল সঠিক রূপ গ্রহণ করে চীনদেশে এবং অমোঘবজ্রই গর্ভধাতুর মধ্যে বিনায়কেন মূর্তি সন্নিবেশিত করেন। ইহার বহিরাবরণে ভারতীয় প্রভাবও বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। বিনায়ক ব্যতীত ঈশান, ইন্দ্র, যম, বরুণ, বৈশ্রবণ, গ্রহপুঞ্জ এবং রাক্ষসাদিও ইহাতে দেখা যায়।

বজ্রধাতুতে গণেশের যে পাঁচটী মূর্তি আছে, তাহাদের মধ্যে চারিটী আছে চারি পার্শ্বে এবং কেন্দ্রে বিনায়কের মূর্তি ইহার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া অমোঘবজ্র বলিয়াছেন—চারি পার্শ্বের চারিটী গণেশ দিগ্‌চতুষ্টয়ের রক্ষক এবং কেন্দ্রস্থ বিনায়ক বিপদ্‌বারণ। ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, অমোঘবজ্র এই ভাবটী ভারতবর্ষ হইতে আনিয়াছিলেন। বিনায়কের মূর্তিটী ভারতীয় মূর্তির অনুরূপ। পার্থক্য শুধু এইটুকু যে, ভারতীয় গণেশ ভগ্ন গজদন্ত ধারণ করিয়া থাকেন এবং বিনায়কমূর্তিতে তৎপরিবর্তে একটী মূলা ধারণ করেন। উত্তর দিকের রক্ষক হিসাবে যে গণেশ থাকেন, বিনায়কের স্থান ঠিক তাঁহারই নীচে। গর্ভধাতুর বিনায়কও বহিরাবরণের উত্তর দিকে অবস্থিত এবং তাঁহার স্থান ঈশানের অনুচরবৃন্দের মধ্যে। গর্ভধাতুতে বিনায়ক ব্যতীত আর কোনও গণেশমূর্তি নাই।

এক্ষেত্রে অনুমান করা যাইতে পারে যে, শুভাকর পরিকল্পিত গর্ভধাতুর নক্সার সাহায্যেই অমোঘবজ্র এবং তাঁহার শিষ্য হুই-কুও বজ্রধাতুর মণ্ডলটী অঙ্কিত করেন। পরে তাঁহারা মণ্ডল দুইটীর সংযোজনকালে বজ্রধাতুর অনুকরণে গর্ভধাতুতে দেবতাদিগের মূর্তিগুলি অঙ্কিত করিয়াছিলেন। শুভাকরের নক্সায় কোথাও গণেশের নামোল্লেখ ছিল না। অমোঘবজ্র এবং হুই-কুইও বিনায়কের চিত্রটী সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন। দৈবশক্তি ও মন্ত্রের প্রভাবের

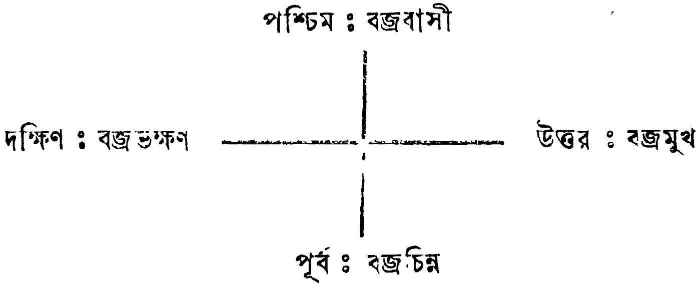
উপর তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল এবং সেই জন্য বিপদ্‌বারণ গণেশের চিত্রটী উভয় নক্সাচিত্রেই সন্নিবেশিত হইয়াছে।

জাপানে গণেশ

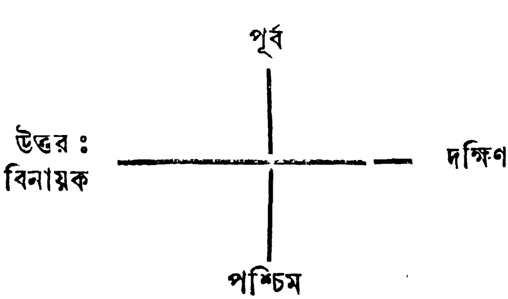
খ্রীস্টীয় নবম শতকের পূর্বে জাপানে গণেশ-সংস্কৃতির প্রবেশ-লাভ ঘটে নাই। এই সময়েই জাপানী বৌদ্ধ ভিক্ষু কোবো দইসি (বা কু-কই) 'মহাবৈরোচনসূত্রে'র শুভাকরসিংহ-কৃত চীনা অনুবাদের পুঁথি পান। মহাবৈরোচনসূত্রের তান্ত্রিক গুহ্যবাদই গণেশ-সংস্কৃতির অনুকূল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। কোবো দইসি একজন বিশিষ্ট ভিক্ষু ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি এই সূত্রের তত্ত্বার্থ বুঝিতে অসমর্থ হন। কোন জাপানী পণ্ডিতও ইহার মর্ম তাঁহার নিকট উদ্‌ঘাটিত করিতে পারেন নাই। তখন তিনি জাপান-সম্রাটের অনুমতি লইয়া ভিক্ষু দেন্‌গ্যো দইসির সমভিব্যাহারে ৮০৪ খ্রীস্টাব্দে তাঙ-রাজসভায় উপনীত হন এবং তথা হইতে 'মহাবৈরোচনসূত্রে'র গুহ্যতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া দিবার জন্য এক জন বৌদ্ধ পণ্ডিতের অনুসন্ধানে চীনের মন্দিরসমূহে গমন করিতে থাকেন। অবশেষে তিনি সিঙ-লোঙ-সুর মন্দিরে গিয়া হুই-কুওর সাক্ষাৎ পান। হুই-কুও এক জন অসাধারণ পণ্ডিত ও সেন-য়েন সম্প্রদায়ের নায়ক ছিলেন। তিনিই কোবো দইসিকে মহাবৈরোস্থচনা গুহ্যতত্ত্ব শিক্ষা দেন। সিন্‌গোন সম্প্রদায়ের মধ্যেও এইরূপ প্রবাদ আছে যে, কোবো দইসি তাঁহার নিকট 'অভিষিক্ত' বা দীক্ষিত হন। হুই-কুও চীনা শিল্পী লি-চেন্‌কে 'মণ্ডলের, দুইটী অংশের চিত্র অঙ্কন করিবার আদেশ দেন এবং সেই দুইটি অংশের চিত্র তিনি কোবে দইসিকে প্রদান করেন। এই দুইটি চিত্র তকওসানের জিন্‌গো-জি মন্দিরে রক্ষিত আছে। চিত্র দুইটি 'তকও-মণ্ডল' নামে পরিচিত। কথিত আছে, তোজির কন্‌গে ইন মন্দিরে রক্ষিত বহুবর্ণ চিত্র 'তোজি-মণ্ডল' কোবো দইসি-কর্তৃক ৮২১ খৃস্টাব্দে চিত্রিত হইয়াছিল।

উক্ত মণ্ডলে দুইটী চিত্রের অনেকগুলি অনুলিপি গৃহীত হইলেও উহার দেবগোষ্ঠী হইতে ভারতীয় রূপেরই আভাস পাওয়া যায়।

কেন্দ্রীয় পরিষদের চতুর্ব্যূহের নায়করূপী গণেশের বজ্রধাতুমূর্তিতে ভরতীয় আদর্শ পরিলক্ষিত হয়। ভারতবর্ষেও এরূপ মূর্তি বিরল নহে। পশ্চিম দিকের নায়কের নাম 'বজ্রবাসী'—ইহার হস্তে তীর ওধনু, পূর্বের নায়ক 'বজ্রচিন্ন'—ইহার হস্তে ক্ষুদ্র ছত্র, দক্ষিণের নায়ককে নাম 'বজ্রভক্ষণ'—ইনি হস্তে পুষ্পমালা ধারণ করেন উত্তরের নায়ক 'বজ্রমুখ'—ইহার হস্তে তরবারি। ইহাদের মধ্যে এক জন নায়কের বন্যবরাহের মুণ্ডবিশিষ্ট হইতেও দেখা যায়; সম্ভবতঃ অসদ্‌যোনিকে ভীতি প্রদর্শন করিবার জন্য এইরূপ পরিকল্পনা করা হইয়াছিল। বজ্রধাতু-মণ্ডলে চারি জন নায়ক এইভাবে থাবেন :



গণেশের পঞ্চম মূর্তি 'বিনয়ায়কের' পরিকল্পনা ব্যতীত বজ্রধাতুতে গণেশের পরিকল্পনাগুলির কোনটাই জাপানে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে নাই। এই বিনায়ক মণ্ডলের উত্তর দিকের নায়ক বজ্রমুখের ঠিক নিম্নেই থাকেন। আমরা জানি, গর্ভধাতু'তে বিনায়ক থাকেন ঠিক উত্তরে। গর্ভধাতুর পরিকল্পনা অনুযায়ী বিনায়কের সংস্থান এইরূপ :



জাপানে বিনায়ক মূর্তিতে গণেশকে মূলা ধারণ করিতে দেখা যায়। ভারতবর্ষ ও সিংহলে এরূপ বড় একটা দেখা যায় না, অন্ততঃ এরূপ প্রচলন ছিল না বলিয়াই মনে হয়। অবশ্য নেপালে ও তিব্বতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে ভগ্ন গজদন্তের স্থানে মূলার ব্যবহার ছিল। ইহা হইতে স্বতঃই অনুমিত হয় যে, মণ্ডলের মূল পরিকল্পনা উত্তর-পূর্ব ভারতে রচিত হইয়াছিল। জাপানী প্রবাদ-অনুসারে আমোঘবজ্র ভারতে প্রত্যাবর্তন করিবার পর তাঁহাকে শ্রমণ নগবোধি মণ্ডল-রচনা প্রণালী শিখাইয়া দেন। এই নাগবোধি আবার তান্ত্রিক সন্ন্যাসী নাগার্জ্জুনের নিকট হইতে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। নাগার্জুন সপ্তম শতকের মধ্যভাগের লোক এবং তিনি দক্ষিণ ভারতের অধিবাসী ছিলেন। দক্ষিণ ভারতের অধিবাসী হইলেও তিনি হিমালয়ে গিয়া মহাযান শিক্ষা, শিক্ষাদান ও প্রচার করেন।[১] তান্ত্রিক বৌদ্ধমতের প্রাচীনতম রচয়িতাদের মধ্যে তিনি একজন। 'একজটা'র উদ্দেশ্যে রচিত 'সাধনমালা'র দুইটি সাধনের তিনি রচয়িতা এবং সম্ভবতঃ কোন কারণে তিনি 'ভোটে'এ (তিব্বতে) অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন। ভোট হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করা হয়।[২] অতএব নাগার্জুন যে তিব্বতে বা অন্ততঃ তিব্বত-সীমান্তে গিয়াছিলেন তাহা নিঃসংশয়ে স্বীকার করা যায়। তথায় তাঁহার পক্ষে মূলাহস্তে গণেশ-মূর্তির পরিচয় পাওয়াও অস্বাভিক নয়। সুতরাং মণ্ডলে গণেশের যে মূলাধারনেরও পরিকল্পনা করা হয়, তাহা নাগার্জুনের অভিজ্ঞতা হইতে শিষ্য-পরম্পরায় অমোঘবজ্র শিক্ষা করেন। অমোঘবজ্র চীনে এই আদর্শের বাহক। তথা হইতে কোবো দইসি জাপানে তাহা লইয়া যান।

গণেশের মণ্ডলের পরিকল্পনা জাপানে প্রচলিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তথায় বিনায়কমূর্তিসমূহ নির্মিত হইতে থাকে। ইকোমার

---

* B. L. Suzuki : Eastern Buddhism. Vol. III, 1924—The Shingon School of Mahayana Buddhism.

£ B. Bhattachary. : Buddhist Esoterism, 68.

হোক্কন্-জি মন্দির বিনায়েকের মন্দিররূপে প্রসিদ্ধ। বিনায়কের রূপের পরিকল্পনাসমূহ পরে অন্যান্য রূপ লাভ করে। বিনায়ক-মূর্তিসমূহের মধ্যে সম্পূর্ণ ভারতীয় আদর্শে পরিকল্পিত গণেশের মূর্তি অন্যতম পরিকল্পনা। ঠিক ভারতীয় রীতির মত তাঁহার এক হাতে একটী ভগ্ন গজদন্ত দেখা যায়, অপর দন্তটী দেখা যায় না। জাপানের গণেশমূর্তিতে অনেক সময় হাস্যস্ফুরিত ভাব পরিলক্ষিত হয়। অধিকাংশ স্থলেই তিনি দণ্ডায়মান এবং তাঁহার হাত দুই হইতে ছয়টী। বজ্রবিনায়ক-মূর্তিতে তিনি বজ্র ধারণ করেন। আবার ককু-জেন্-চো-মূর্তিতে তাঁহার তিনটি মুণ্ড এবং প্রত্যেক মুণ্ডে তিনটী করিয়া চক্ষু দেখা দেখা যায়; চারি হস্তের একটীতে তরবারি, একটীতে মূলা, একটীতে সম্ভবতঃ মোদক ও একটীতে দন্ত থাকে। জাপানীদের মতে, ইনি পর্বতে উপবিষ্ট থাকেন এবং ইনি 'হস্তিযুথের অধিপতি'।

কোবো দইসির পরে খুব বেশী দিন গণেশ-পূজার প্রভাব জাপানে থাকিতে পারে নাই। কারণ বিনায়ক বরাবরই গৌণ দেবমণ্ডলীর মধ্যে স্থান পাইয়াছেন এবং গণেশ-সংস্কৃতিও জাপানে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না। কঙ্গি-তেন-সংস্কৃতিই জাপানে কিছু দিন স্থায়ী হইয়াছিল এই সংস্কৃতি কোবো দইসিই আনিয়াছিলেন। গুহ্য ও গুপ্ত কঙ্গি-তেন-সংস্কৃতি যোগবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। কঙ্গি-তেন যুগ্মদেবতাকে সিন্‌গোন-সম্প্রদায় সচ্চিদ্‌ব্রহ্ম (বৈরোচন) ও আদ্যা প্রকৃতির (স্ত্রী--রূপী অবলোকিতেশ্বরের) মিলনের প্রতীক বলিয়া অভিহিত করে। কঙ্গি-তেনকে জাপানীরা কঙ্গি-দেন, দইসো কঙ্গি-দেন নামে এবং বেশীর ভাগ সো-দেন সম ও তেন-সন সম নামেও অভিহিত করিয়া থাকে।

শ্রী-রূপী অবলোকিতেশ্বরের একাদশমুণ্ডবিশিষ্ট একটী মূর্তি অমোঘবজ্র জাপানে আনেন। এই অবলোকিতেশ্বরের জাপানী

নাম—জু-ইচি-মেন কন্নোন। তবে জাপানীরা স্ত্রী-রূপী অবলোকিতেশ্বরকে শুধু 'কন্নোন' নামেই অভিহিত করিয়া থাকে। কঙ্গি-তেন-মন্দিরে জু-ইচি-মেন কন্নোনের মূর্তি প্রায়শঃ দেখা যায়।

৭২০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় শ্রমণ বজ্রবোধি ও তাঁহার সিংহলদেশীয় শিষ্য অমোঘবজ্র গুহ্য মতবাদের মূলতত্ত্ব চীনদেশে প্রচার করেন। তাঁহারা চীনদেশে শুধু মন্ত্র, ধারণী, মণ্ডল প্রভৃতি তন্ত্রসাধনের প্রবর্তন করেন নাই, আত্মা ও পরমাত্মার মিলনরূপ যোগবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত আদিবুদ্ধ ও মহাবৈরোচন-সংস্কৃতিরও প্রবর্তন করিয়াছিলেন। বজ্রবোধির মৃত্যুর পর অমোঘবজ্র মহাবৈরোচনসূত্রের অনুলিপির সন্ধানে সিংহলে ফিরিয়া আসেন। তিনি ভারতেও আসিয়াছিলেন, বজ্রবোধির সহিত যখন তিনি চীনে যান তখন যে পাণ্ডুলিপিটি তাঁহাদের সঙ্গে ছিল তাহা সমুদ্রপথে প্রবল ঝড়ে বিনষ্ট হইয়া যায়। দক্ষিণ ভারতে ভিক্ষু নাগবোধির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তিনি বজ্রধাতু-নক্সাচিত্রের গুহ্যতত্ত্ব শিক্ষা করিয়াছিলেন, একথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। পরে ৭৪৬ খ্রীষ্টাব্দে চীনে প্রত্যাগমনকালে তিনি মণ্ডল, বহু তন্ত্রগ্রন্থ ও মহাবৈরোচনসূত্রের একটি অনুলিপি সঙ্গে আনিয়াছিলেন। জাপানে এইরূপ প্রবাদ আছে যে, তিনি একাদশমুণ্ডবিশিষ্ট অবলোকিতেশ্বরের একটী মূর্তিও চীনদেশে আনেন।

য়ুয়ন্-চৌয়ঙের পূর্বেই দোশো-কর্তৃক চীনদেশে যোগের প্রবেশলাভ ঘটিয়াছিল এবং উহা চীনে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। তথা হইতে উহা জাপানে নীত হয়। অমোঘবজ্রের পূর্বে চীনে যোগের এই প্রতিষ্ঠা হইলেও বস্তুতঃ তিনি ও তাঁহার চীনা শিষ্য হুই-কুও উহার অধিকতর প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হন। এই দু'জনেরই না কি অলৌকিক ক্ষমতা ছিল। এই অলৌকিক ক্ষমতার একটী দৃষ্টান্ত এইরূপ—কোবো দইসির যখন অভিষেক হয়, তখন হুই-কুও তাঁহাকে দীক্ষা দিয়াছিলেন। সেন্-য়েন (বা সিন্‌গোন্)-

প্রবাদানুসারে এই সময়ে একটী অলৌকিক ব্যাপারের অবতারণা করা হয়। উহাতে কোবো দইসি ক্ষণেকের জন্য আদিবুদ্ধ বৈরোচনের সহিত একীভূত হইয়াছিলেন।* জাপানের সিন্‌গোন-সম্প্রদায়ের মধ্যে এইরূপ আর একটী অপ্রাকৃত ঘটনার কথা প্রচলিত আছে। ৮০৬ খৃষ্টাব্দে কোবো দইসি যখন জাপানে প্রত্যাগমন করেন, তখন জাপ-সম্রাট কর্তৃক তিনি তৎপ্রবর্তিত সিন্‌গোন সম্প্রদায়ের গুহ্যতত্ত্ব প্রকাশ করিয়া বুঝাইয়া দিবার জন্য আদিষ্ট হন। সম্রাট সপারিষদ ও বৌদ্ধ প্রধান-পরিবেষ্টিত ছিলেন। কোবো দুইসি 'মিক্যো' মতবাদ বিশ্লেষণ করিবার সময় নাকি ক্ষণিকের জন্য বৈরোচন-মূর্তিতে আদিবুদ্ধের রূপ প্রদর্শন করিয়াছিলেন।* এই ঘটনার পর সর্বভৌম পরমপুরুষের সহিত ব্যক্তিবিশেষের সম্মিলনের মূলসূত্র সিনগোন সম্প্রদায়ের গুহ্য মতবাদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে এবং কঙ্গি-তন সংস্কৃতির রহস্যবাদ তাহাদের মধ্যে গৃহীত হয়। জাপানে আসিবার সময় কোবো দইসি তন্ত্রগ্রন্থগুলির সহিত কঙ্গি-তেনের কোন মূর্তি আনিয়া ছিলেন এরূপ প্রমান পাওয়া যায় না। যদি তিনি না আনেন তাহা হইলে চীনা ভিক্ষু চুঙ-সে (জাপানী নাম-কইংশিস্থ) এই কৃতিত্বলাভের অধিকারী। ইনিই সিনগোন বৌদ্ধগণকে কঙ্গি-তেন-মূর্তির সম্পূর্ণ ও প্রামাণ্য পরিকল্পনা দেন। ইহার পরিকল্পনানুযায়ী কঙ্গি-তেনের মূর্তি ধাতুনির্মিত হইবে। এবং উহা ২২ ইঞ্চির অধিক উচ্চ হইবে না। উভয় মূর্তির সর্ম্মুখভাগ পরস্পরের দিকে থাকিবে। উভয় আলিঙ্গনবদ্ধাবস্থায় থাকিবে এবং দুইহাতে উভয় উভয়কে জড়াইয়া থাকিবে। উভয়ের মস্তক পরস্পরেরস্কন্ধের উপর ন্যস্ত হইবে। তাঁহাদের পরিধেয় হইবে চরণ পর্যন্ত প্রলম্ব।

জাপানে বৌদ্ধ মন্দিরের বহির্দ্বারে রক্ষী নি-ওর সহিত কঙ্গি-

* A Lloyd : Development of Japanese Buddhism (Jour. Asia. of Japan-এ প্রকাশিত)।

* B. L. Suzuki ; Singon School of Mahayana Buddbism.

তেনের বেশ একটা সামঞ্জস্য দেখা যায়। এই সামঞ্জস্য দেখিয়া উভয়ের ঐক্য-সম্বন্ধে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। উভয়েই মন্দিরের রক্ষী। কঙ্গি-তেনের মত নি-ওও একত্রে পরিকল্পিত যুগ্মদেবতা মণ্ডলের দুই অংশে ঐজেনের অভিব্যঞ্জনায় নি-ওর স্থান আছে—এই পরিকল্পনা 'গর্ভ' বা বাস্তব জগতের প্রতীক, পক্ষান্তরে ফুদো নামক দেবতা 'বজ্র' বা তত্ত্বভূত জগতের প্রতীক। বহির্দ্বারে রক্ষীরূপে নি-ওর প্রতিষ্ঠা যে জাপানেই কেন্দ্রীভূত ছিল তাহা নহে, সুদূর পশ্চিমে চীনা তুর্কীস্থান পর্যন্ত ইহার নিদর্শন পাওয়া যায়। চীনা তুর্কীস্থানের বজ-কলিক নামক স্থানের একটী সুবৃহৎ মন্দিরের প্রবেশদ্বারে এইরূপ মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ভারতে ত্রিপুরারাজ্যে ঊনকোটী পাহাড়ের উপর গণেশের একটি সুবৃহৎ মূর্তির উভয় পার্শ্বেও এইরূপ মূর্তির সমাবেশ দেখা যায়। ‡ সম্ভাবতঃ এইরূপ মূর্তিতে রক্ষীর মূর্তির পরিকল্পনা করা যাইত। কঙ্গি-তেন যেমন মন্দিরের রক্ষী, তেমনি বহির্দ্বারে রক্ষীরূপে নি-ওরও পরিকল্পনা হইয়াছিল, এইরূপ মনে করা অঙ্গত নয়।

কঙ্গি-তেন যুগ্মমূর্তিতে স্ত্রী বিনায়ক মস্তকে মুকুট ও পুরুষমূর্তি চিন্তামণি ধারন করিতে পারেন। চীনা শ্রমণ হন্-কুয়াঙর বিধানানুসারে গণেশের যুগ্মমূর্তিতে নারী দেবতা উভয় স্কন্ধ বস্ত্রাচ্ছাদিত থাকিবে এবং পুরুষের এক বা উভয় স্কন্ধই নগ্ন হইবে। এরূপ মূর্তি জাপাণে দেখা গেলেও আবার অনেক ক্ষেত্রে নারী মূর্তির স্কন্ধ নগ্নই দেখা যায়। আবার এক প্রকার কঙ্গি-তেন মূর্তির নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, উহা পরস্পর আলিঙ্গনাবস্তায় না থাকিয়া উভয়ে পিঠে পিঠ দিয়া একত্র সম্মিলিত; * কিন্তু আশ্চর্য এই যে তাঁহাদের চরণযুগল সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে ঘোরান। কঙ্গি-তেন মূর্তিরপরিকল্পনার ইহাই মাত্র পরিণতি নয়, পরে তাঁহারা পাশাপাশি অবস্থায়ও পরিকল্পিত হইয়াছিলেন—এরূপ মূর্তিও পাওয়া গিয়াছে।

‡ Archaeological Survey of India, 1921-2, Pl. XXXa.

* Sir Charles Eliot : Japanese Buddhism, 356.

জাপানে কঙ্গি-তেনের মূর্তিপরিকল্পনায় তিনটি বিভিন্ন ব্যাখ্যা আছে—একটি সাধারণ বা লৌকিক, একঠি গুহ্য এবং একটি উভয়ের মধ্যস্থস্বরূপ। যাঁহারা দীক্ষার অভিষেক লাভ করিবেন তাঁহাদের নিকট আর চতুর্থ একটি মূর্তির পরিকল্পনা দেওয়া হইত। এই চারটির প্রত্যেকটিতেই কঙ্গি-তেন গুপ্তভাবে পূজিত হইতেন এবং তাঁহাদের মূর্তি সাধারণ ভক্তদের সমক্ষে প্রদর্শিত হইত না। মন্দিরের একটি গুপ্ত কক্ষে যখন কঙ্গি তেনকে রাখা হইত, অর্থাৎ পূজার জন্য প্রকাশ্যে রাখা হইত না, তখন সেই মূর্তি একটি আবরণের মাধ্য রাখা হইত; আবার যখন তাঁহাদের মূর্তি জু-চি'র † মধ্যে রক্ষিত থাকিত তখন দ্বার সমুহ বন্ধ রাখা হইত।

কঙ্গি-তেনের প্রার্থনার নিয়মসমূহ কোবো দইসিই জাপানে প্রবর্তিত করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি গণেশের পূজা করিয়াছিলেন কিনা জানা যায় না। একক বা যুগ্ম যে কোন মূর্তিতে কোবো দইসি গণেশ পূজা করিয়াছিলেন এরূপ সন্ধান পাওয়া যায় নাই। গণেশ পূজা অনুষ্ঠান আরম্ভ হইতে 'সকে'-ও ওবেদানা ফল উৎসর্গ করিয়া—অতঃপর ধূপধুনার গন্ধসহ দেবতার উদ্দেশ্যে তান্ত্রিক মন্ত্র পাঠ করা হইত। মন্দিরের জলাধারে বা পবিত্র তৈলে মূর্তিটি ডুবান হইত। এখনও জাপানের ধনী গৃহস্থের ঘরে গণেশের গুপ্ত পূজার প্রচলন আছে। একটি ব্রোঞ্জনির্মিত পাত্রে সংস্কৃত শণের বীজের তৈল ঢালিয়া মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক এক শত আটবার উহাকে পূত করা হয়। তারপর ঐ তৈল উত্তপ্ত করা হয় এবং তাহাতে কঙ্গি-তেন মূর্তি ডুবাইয়া দেওয়া হয়—মূর্তিটি পাত্রের ঠিক মধ্যভাগে দাঁড়াইয়া থাকে। তদনন্তর একটি তামার হাতলযুক্ত ব্রোঞ্জের হাতা দিয়া ঐ তৈল এক শত আটবার তুলিয়া মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক কঙ্গি-তেন-মূর্তির মাথায় ঢালিয়া দেওয়া হয়। বর্তমানে এইরূপ পূজা ব্যতীত অন্য কোন ভাবে পূজার প্রচলন জাপানে বড় একটা দেখা যায় না। জাপানের কোয়-সন্-মন্দিরের সিন্‌গোন পুরোহিত শ্রীযুক্ত এম. মোরিতা বর্তমান চীনা রীতি-সম্বন্ধে অ্যালিস্ গেটিকে লিখিয়া জানান যে, চীনারা এখনও পূজানুষ্ঠানের সময় স্বর্গীয় দেবতাদের এইরূপ পূজা

† 'জু-চি' দেবমূর্তি রাখিবার এক প্রকার আধার। এই অধারের ঢাকনি এত স্বচ্ছ যে, বাহির হইতে ভিতরের মূর্তি দেখা যায়।

ব্যতীত অন্য কোনভাবে পুজার প্রচলন জাপানে বড় একটা দেখা যায় না। জাপানের কোয়-সন্-মন্দিরের সিন্‌গোন পুরোহিত এম. মোরিতা বর্তমান চীনা রীতি-সম্বন্ধে অ্যাসিস্ গোটিকে লিখিয়া জানান যে, চীনারা এখনও পূজানুষ্ঠানের সময় স্বর্গীয় দেবতাদের জন্য একটী বেদী নির্মাণ করে; ইহার উদ্দেশ্য, অসদযোনিবর্গকে দূরীভূত করিয়া প্রার্থনার আকাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করা।

অমোঘবজ্র যে একাদশমুণ্ডবিশিষ্ট অবলোকিতেশ্বর মূর্তি জাপানে আনেন, জাপানীরা ঐ দেবতাকে 'কল্লোন' নামে অভিহিত করে। কঙ্গি-তেন-মন্দিরে এই কল্লোনের মূর্তি প্রায়শঃ দেখা যায়। চীনে যুগ্মমূর্তির যে প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, যদি উহা তিব্বত হইতে আসিয়া থাকে তাহা হইলে পক্ষান্তরে উহা বিনায়ক ও তাঁহার শক্তির মিলিত মূর্তি বলিতে হইবে। বিনায়কের শক্তির সহিত অবলোকিতেশ্বরের অভিন্নত্ব আছে কি না দেখিতে হইবে। অমোঘবজ্র সিংহল হইতেই অবলোকিতেশ্বরকে জাপানে আনিয়াছিলেন।* সিংহলে অবলোকিতেশ্বর 'লোকনাথ' নামে পরিচিত। এই লোকনাথের রূপ বা অভিব্যঞ্জনা আটটী; তন্মধ্যে প্রথম চারিটী —'ব্রহ্মানাথ,', 'বিষ্ণুনাথ', 'শিবনাথ', ও 'গৌরীনাথ' এবং অষ্টম রূপ 'গণনাথ'। † সিংহলী বৌদ্ধশাস্ত্রে গণনাথের যে রূপ বর্ণনা আছে তাহার ভারতের গণেশ মূর্তির সহিত হুবহু মিলিয়া যায়। সুতরাং গননাথ মূর্তিতে বিনায়কের সহিত বোধিসত্ত্বের একত্ব পরিকল্পনা করা হইয়াছে। আবার 'কারণ্ডব্যূহে' দেখিতে পাওয়া যায়, বোধিসত্ত্ব আপনাকে গণেশের সহিত অভিন্ন বলিয়া প্রকাশ করিতেছেন—তিনি বলিতেছেন, সমুদয় জীবগণকে ধর্ম শিক্ষা দিবার জন্য তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, গণেশ প্রভৃতি রূপ পরিগ্রহ করিবেন এবং যতক্ষণ না মানবকুল মুক্তি পায় ততক্ষণ তিনি শূন্যতা গ্রহণ করিতেন না। কারণ্ডব্যূহের সহিত অমোঘবজ্র পরিচিত ছিলেন। সুতরাং অবলোকিতেশ্বরের সহিত গণেশকে অভিন্ন দেখায় তাহার পক্ষে অসম্ভব নয়। জাপানে গণেশ এইরূপ রূপ লইয়াছিল ইহাই অনুমান করা যায়।

---

* Altce Getty : Ganesa, 82-3.

† 'মহানির্বাণতন্ত্রে' আবার লোকনাথের রূপ বারটী, তন্মধ্যে একটী রূপ 'গণনাথ'।